বঙ্গ
কমলবার্তা
জানুয়ারি সংখ্যা। ২০২৪। মূল্য ২৫ টাকা

ঘুঁসছে সন্দেশখালি

শক্তিরূপেণ সংস্থিতা

ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে সন্দেশখালি

বিধানসভায় শাহজাহানের পাশে মুখ্যমন্ত্রী

মমতার দলদাস পুলিশের অত্যাচারে অসুস্থ রাজ্য বিজেপি সভাপতি

অপদার্থ মমতা সরকার

ক্যাগ রিপোর্টে অস্বস্তিতে তৃণমূল

মরিচঝাঁপি গণহত্যা

মোদি সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেট

দিল্লিতে অভিভাবক-ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের নিয়ে 'পরীক্ষা নিয়ে চর্চা'-য় প্রধানমন্ত্রী।

আসামের গুয়াহাটিতে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে জনতার উচ্ছ্বাস।

রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিনে কিছু বিশেষ মুহূর্ত।

বঙ্গ
কমলবার্তা
জানুয়ারি সংখ্যা। ২০২৪

জ্বলছে সন্দেশখালি ৪
সুস্মিতা মণ্ডল

মোদি সরকারের অন্তবর্তী বাজেট ৭
দিব্যেন্দু দালাল

ক্যাগ রিপোর্টে অস্বস্তিতে তৃণমূল সরকার ১০
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

পাটলিপুত্রে পালাবদল ১২
সৌভিক দত্ত

অপদার্থ মমতা সরকার ১৪
নারায়ণ চক্রবর্তী

সচিত্র হীরক রানির কুকীর্তি (পর্ব-২) ১৬

ছবিতে খবর ১৮

১০ বছরে বিশ্ব অর্থনীতিতে ৫ নম্বরে মোদির ভারত ২৪
সুদীপ্ত গুহ

ভারতের বিদেশনীতি বিষয়ক কথকতা ২৮
অনিকেত মহাপাত্র

মরিচঝাঁপি গণহত্যা ৩০
রুবি সাঁই

ফেক নিউজ ৩৩

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

কোথায় সন্দেশখালির শাহজাহান? না না বেতাজ বাদশা নয়। নোনা জলের বাঘের চেয়েও হিংস্র এক জানোয়ার, তৃণমূলের প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা সন্দেশখালির শাহজাহান শেখ। যে শাহজাহান আর তার ডান হাত শিবু হাজরা এলাকা শুঁকে শুঁকে খুঁজে বার করত কোন হিন্দু বাড়িতে আছে তরুনী কন্যা সন্তান? কোন হিন্দু বাড়িতে আছে যুবতী স্ত্রী? তারপর তাঁর ডাক পড়ত পার্টি অফিসে। যেখানে দেওয়াল জুড়ে মমতা-অভিষেকের ছবি। হাসছে। তারপর শুরু হত অত্যাচার। অপুষ্টিতে জীর্ণ রোগা রোগা দুর্বল শরীরগুলো যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলে বিদ্যাধরীর জলে পূর্ণিমার চাঁদ উথালপাথাল হয়ে আছড়ে পড়ত কিন্তু কেউ রুখে দাঁড়ানোর সাহস পায়নি। সন্দেশখালিতে অত্যাচারই ছিল আইন। যেখানে সারারাত ধরে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে আমাদের লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গাদের। যে এলাকার মানুষ দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়না। ক্ষিদের যন্ত্রণা যাদের চোয়াল-পাঁজরা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। অভিষেকের মত দুবাই-আমেরিকায় যাদের চোখের চিকিৎসা করানোর পয়সা নেই, তাঁদের শরীর-প্রাণ নিয়ে যখন তৃণমূলের শাহজাহানরা ছিনিমিনি খেলছিল তখন কোথায় ছিল শিবু- শাহজাহানদের একমাত্র খুঁটি, সততার প্রতীক পোটোপাড়ার 'অগ্নিকন্যা' আর তাঁর খেলুড়ে ভাইপো 'ডালিম শেখ'?

২০১৯ সালে সন্দেশখালির ভাঙ্গিপাড়া এলাকা থেকে নিখোঁজ হয়ে যান তিন বিজেপি কর্মী। আজও তাঁদের খোঁজ মেলেনি, খুনের অভিযোগ ছিল শাহজাহানের বিরুদ্ধে। এই সেই সন্দেশখালি যেখানে ২০১৯ সালেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের ধরতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন এক অফিসার সহ তিন পুলিশ কর্মী। সন্দেশখালি থানা থেকে মাত্র ৫ কিমি দূরের খুলনা গ্রামে। এলাকার ডন তখন শাহজাহান। কে আছে শাহজাহানের পিছনে? বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে বিপুল পোশাক কিভাবে পাচার হত কলকাতায়? কিভাবে ছোট কলাগাছি, বিদ্যাধরী ও রায়মঙ্গল নদীর চর অবৈধ ভাবে দখল হয়েছিল? কিভাবে ২০২২ সালে সেই চরে তৈরি হয়েছিল শাহজাহানের কন্যার নামে মাছের হ্যাচারি? কিভাবে ব্লক মৎস্য দফতর থেকে সেই হ্যাচারিতে সরাসরি চলে আসত এলাকার মাছ চাষিদের জন্য বিনামূল্যের পোনা? কেন চুপ করে ছিল মৎস্য দফতর এবং সেচ দফতর? কিভাবে বাসন্তী হাইওয়ের ধারে ১০০ বিঘা জমির ওপর শাহজাহানের বাগানবাড়ি হল? নারী পাচার থেকে শুরু করে গরু পাচার, কাঠ পাচার, হেরোইনের ব্যবসা, খুন-ধর্ষণ সহ একাধিক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও শাহজাহানকে পুলিশ-প্রশাসন ছুঁতে পারেনা কেন? কিসের ভয়ে? কার ভয়ে? –উত্তর সবাই জানে। পুলিশও জানে। ভয়ে বলতে পারেনা।

উত্তর খুঁজতে সন্দেশখালির পথে টাকিতে মমতার দলদাস পুলিশের অত্যাচারে অসুস্থ বিজেপি রাজ্য সভাপতি যখন হাসপাতালে, ঠিক তখনই রাখঢাক না করে বিধানসভায় শাহজাহানের পাশে দাঁড়িয়েছে হীরক রানী। 'নব জোয়ার যাত্রা' যেদিন বসিরহাট এলাকায় পৌঁছেছিল তখন 'ডালিম শেখ'-এর পাশে এই হিংস্র জানোয়ার শাহজাহান আর তার দলবল ছিল। তারও আগে ২০১৯ সালে পোটোপাড়ার হীরক রানি বলেছিলেন, "সিপিএমের সব লোক খারাপ আমি মনে করি না। শাহজাহান কিন্তু লক্ষ্মণ শেঠ নয়। ও এলাকায় পপুলার।"

বাংলায় নারী সুরক্ষার স্বার্থে, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সন্দেশখালির সন্ত্রাস নিয়ে জবাব দিতে হবে ডালিম শেখ আর হীরক রানিকেই।

জয় হিন্দ।

মা-মেয়েদের ক্ষোভের আগুনে
জ্বলছে সন্দেশখালি

সুস্মিতা মণ্ডল

চাকরি চুরিতে একের পর এক বাংলার বাঘেরা যেমন খাঁচায় বন্দি, ঠিক তেমন খাঁচাই প্রয়োজন সন্দেশখালির 'হিংস্র' তৃণমূলীদের জন্য? সভ্যসমাজে থাকার যোগ্য নয় ওরা। কোথায় শেখ শাহজাহান আর তার ডানহাত শিবু হাজরা? তৃণমূলের পার্টি অফিসে দিনের পর দিন ওরা যা করেছে তাতে সুন্দরবনের জন্তু-জানোয়ারও শিউরে উঠবে। সুন্দরবনের বাঘ লোকালয়ে চলে এলে যেমন ফাঁদ পেতে ধরা হয়, সন্দেশখালির সাধারণ মানুষের চোখে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের থেকেও ভয়ঙ্কর ও 'হিংস্র প্রাণী'-রা কেন খাঁচায় বন্দি থাকবেনা!

স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন লাগোয়া নদীঘেরা একখণ্ড সন্দেশখালি যেন একবিংশ শতকে নেই, তৃণমূলের লাগামছাড়া ধারাবাহিক সন্ত্রাসে ফিরে গেছে মধ্যযুগে। ওখানকার মানুষ আজ জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘের থেকেও বেশি আতঙ্কে থাকে তৃণমূলের পিশাচ বাহিনীর পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপনায়।

সেখানে সাধারণ মানুষের প্রাপ্য সরকারী পরিষেবা পাওয়ার বিনিময় মূল্য নারী শরীর; সৌজন্যে, সন্দেশখালির তৃণমূলের বেতাজ বাদশা শাহজাহান ও তার পারিষদগণ। সরকারি কাজের সমস্ত বেনিয়মে হাত পাকিয়ে এরা দিদির আস্থা অর্জন করেছে আর পেয়েছে অবাধ লুণ্ঠন, অপশাসন আর শোষণের অধিকার। আট থেকে আশি বছরের মহিলা সব যেন নবাব বাদশাহদের হারেমের (সরকারের) সম্পত্তি। যখন খুশী, যাকে খুশি, যতদিন খুশী তুলে এনে অনন্ত সম্ভোগের আবিল খেলায় মেতেছে ওরা। কোথায় পায় ওরা এতো সাহস? এই ছাড়পত্র কি মা মাটি মানুষের কল্যাণে? অবৈধ বন্দুক, মদ আর কাঁচা পয়সায় বলীয়ান হয়ে নারী ও জমির একচেটিয়া সাম্রাজ্যের অধিকারী হতে বেপথু যুবকদের লালসাময় জীবন উপহার দিতে কোন শক্তি আজ ধরাধামে অবতীর্ণ? সরকার কোথায়? প্রশাসন আর কত ঘুমিয়ে থাকবে? বোম বাঁধো, গুলি করো, ঘর ভাঙো, আগুন ধরাও, জমি দখল করো, কৃষিকাজের জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে দাও। যদি তাতেও অবাধ্য জনগণকে বশে আনা না যায় তবে মেয়ে বউদের তুলে আনো।

সম্প্রতি আমরা সুন্দরবনের নারী পাচার নিয়ে এক তৃণমূল বিধায়ক তথা মন্ত্রীর অভিনীত ও পরিচালিত সিনেমা দেখেছিলাম। সিনেমার নাম "আবার প্রলয়"। তার একটাই দিক ছিলো নারী পাচার। যার বাস্তবায়নে "মা মাটি মানুষ" আজ সারা সুন্দরবন জুড়ে সেই প্রলয়ের খেলাতেই মেতেছে। এদের বহুমুখী প্রতিভায় সন্দেশখালির সাধারণ মানুষের জীবন যন্ত্রণায়, গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো নেতাদের যোগ্য সংগতে আছে "মা মাটি মানুষ"-এর পুলিশ মন্ত্রীর পুলিশ বাহিনী। পুলিশ, প্রশাসন আর তৃণমূল সব গুলিয়ে এক হয়ে

গেছে। পুলিশ আর প্রশাসনের মদতে সব কাজ চলে প্রকাশ্যে। চাষের জমি জবরদখল করে নোনা জল ঢুকিয়ে জমিকে ফসলহীন করে দিয়ে ভেড়ি বানানোর দক্ষতা ইংরেজ আমলের নীলচাষের ভয়াবহতাকেও হার মানাবে। সন্দেশখালির সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা, পরিবারে সন্তানের নিরাপত্তা এবং মেয়েদের সম্মানের প্রশ্নে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অসহায় মানুষজন প্রাণের ভয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। ধিকিধিকি জ্বলছিল তুষের আগুন। খেলা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে, এলাকা দখলে রাখতে তৃণমূল নেতা শিবু হাজরা-উত্তম সর্দারেরা দলবল নিয়ে অগ্নি সংযোগ, ভাঙচুর ও নারকীয় অত্যাচারে মত্ত হয়ে ওঠে। ঠিক তখনই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে তৃণমূলের সন্ত্রাসের প্রতিরোধে পথে নামেন মহিলারা। দীর্ঘদিনের অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সমস্ত মহিলারা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লাঠিকে ত্রিশূলে পরিনত করে অসুর নিধনে নেমেছেন, এ একমাত্র মাতৃশক্তির পক্ষেই সম্ভব। কারন তাঁদের মেয়েদের (বলা ভালো ছাত্রীদের) তৃণমূলীদের লালসা থেকে,পাচারের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। ছেলেদের মদ,বন্দুকের থেকে আড়ালে রাখতে হবে। স্বামীকে মারের হাত থেকে,বাড়ির জমিকে নেতার গ্রাস থেকে বাঁচাতে সন্দেশখালির মা-মেয়েরা আজ তাই জীবন বাজি রেখে রাস্তায় নেমেছেন। প্রণাম জানাই সেই মাতৃ শক্তিকে।

মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার মাঝে ইন্টারনেট বন্ধ, ইন্টারনেট বন্ধ রেখে কি মানুষের মুখ বন্ধ রাখা সম্ভব? আমাদের লজ্জা, পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। যার অনুপ্রেরণা ছাড়া রাজ্যের ঘাসপাতামূল কিছুই নড়েনা। সন্দেশখালির শাহজাহানরা বেতাজ বাদশা হয়ে ওঠে পুলিশ ও প্রশাসনের প্রশ্রয়েই। শাহজাহানদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে গেলে পুলিশ শাহজাহান দের কাছেই পাঠায় মিটিয়ে নেবার জন্য। আহা, কি সুন্দর চোর-পুলিশ খেলা!লাঠি হাতে তুলে নেওয়া ছাড়া সন্দেশখালির মহিলাদের কাছে

সন্দেশখালি যাওয়ার পথে বাসন্তী হাইওয়ের কাছে বিজেপির পরিষদীয় দলকে পুলিশের বাধা।

বিকল্প কিছুই ছিলনা। মহিলারা যেমন সহ্য করতে জানে তেমনি সহ্যের সীমা ছাড়ালে মা দূর্গা হতেও জানে। সন্দেশখালির রাস্তায় তাই চোখে আগুন নিয়ে মা দূর্গা বাহিনীর অবস্থান। অপশাসনের নিষ্কৃতি চাই।

সন্দেশখালিতে স্বাধীন দেশের নাগরিক অধিকার চাই। নিরাপত্তা চাই। আন্দোলনকারীদের। নিরপেক্ষ প্রশাসন চাই। এলাকায় আইনের অধিকার চাই।

মমতার দলদাস পুলিশের অত্যাচারে অসুস্থ বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

অথচ রাজ্যের প্রশাসনের প্রধান তাঁর দলদাস পুলিশকে দিয়ে বিজেপির লোকজনদের বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের উপর অত্যাচার, পুরুষদের গ্রেফতার চালাচ্ছেন। বিকাশ সিংহ, বসিরহাটের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। কিন্তু গ্রেফতার করে আজ আর সন্দেশখালির মায়েদের আন্দোলন থামানো সম্ভব নয়। সন্দেশখালির বিডিও-কে মেরে তাঁকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে ভর্তি করতে পারে, বদলিও করাতে পারে এরা কিন্তু সাধারণ মানুষের আর নতুন করে কিছু হারাবার নেই। দেওয়ালে পিঠ, তাই সামনাসামনি আন্দোলনই একমাত্র পথ।

পুলিশ এবং প্রশাসনের মদতপুষ্ট হয়ে তৃণমূলের মাফিয়ারা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যে কাজগুলি দিনের পর দিন চালাচ্ছে, আজ সময় হয়েছে তার জবাব নেওয়ার—

১। ২০০৭ সাল থেকে বি এস এফ, কাঁটাতার (ফেন্সিং) দেওয়ার জন্য জমি চেয়েও মমতা সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছে না কেন? কেন উন্মুক্ত সীমান্ত?

২। অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে Demography বদলে দিয়ে কোন অনুপ্রেরণার বাতাবরণ তৈরির কারখানা ওখানে?

৩। রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভারতীয় হিন্দুদের রুটিরুজি ও দেশের সার্বভৌমত্বের উপর চক্রান্তের নীল নকশা কারা তৈরি করেছে? সরকারের বক্তব্য কি?

৪। দুই বাংলার এজেন্ট মারফত ভুয়ো ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ডের অবাধ ব্যবসা নিয়ে কেন প্রতিবাদ জানায়নি রাজ্য সরকার?

চাকরি চুরিতে যেমন একের পর এক বাংলার বাঘেরা খাঁচায় বন্দি, তেমনি তৃণমূলের এই লম্পট, হিংস্র জমি হাঙরদেরও অবিলম্বে জেলে পাঠাতে হবে।

বিকল্প ভাবনার সময় এসেছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি মাননীয় সুকান্ত মজুমদার এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সন্দেশখালির সাধারণ মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেবার লড়াইয়ে রাজ্যের সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে আবেদন জানাই সন্দেশখালির অসম সাহসী মহিলাদের পাশে থাকুন। আপনাদের সমর্থন ওদের মনের শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

“সন্দেশখালিতে শাহজাহানকে ‘টার্গেট’ করে ইডি ঢুকল। সেই নিয়ে গোলমাল করে সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের মধ্যে ঝামেলা লাগানো হচ্ছে। ওখানে আরএসএসের বাসা রয়েছে” - বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোদি সরকারের
অন্তবর্তী বাজেট

দিব্যেন্দু দালাল

২০২৪-এ মোদি সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেট মুখরক্ষার বাজেট নয়। তেলা মাথায় তেল দেওয়ার বাজেটও নয়। বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এই বাজেট, নরেন্দ্র মোদির ঘোষিত তৃতীয় দফা সরকারের রূপরেখা। দেশ নির্মাণের এই গতিপথে সর্বাগ্রে থাকবে নারী, যুব শক্তি, কৃষক এবং গরীব পরিবার।

গত ১লা ফেব্রুয়ারি মাননীয়া অর্থমন্ত্রী শ্রীমতি নির্মলা সীতারামন সংসদে বাজেট পেশ করেন। নির্বাচনের বছর হওয়ার দরুণ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করার সুযোগ নেই তাই এটা ছিল অন্তর্বর্তী বাজেট। বাজেটে একদিকে যেমন পরিকাঠামো ও অন্যান্য ক্ষেত্রে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হয়েছে তেমনই অনগ্রসর ও প্রান্তিক মানুষদের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আবার বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজকোষের ঘাটতি বা Fiscal deficit কেবল নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নয় আনুমানিক স্তর থেকেও কম করা সম্ভব হয়েছে। ২০২৪ অর্থবর্ষে রাজকোষের ঘাটতির পরিমাণ আগের অনুমান ৫.৯% থেকে কমে ৫.৮% হয়েছে এবং আগামী ২০২৫ অর্থবর্ষে সেটা আরো কমিয়ে ৫.১% করার আত্মবিশ্বাসী লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

কোভিড পরবর্তী কালে স্বাভাবিক কারণেই আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার ফলে রাজকোষের ঘাটতি ঊর্ধমুখী হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিসংখ্যান বলছে যে সরকার আয় ও ব্যয়ের মধ্যে নতুন করে ভারসাম্য আনতে সক্ষম হয়েছে যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। অমৃতকালের এই সময় কেন্দ্র সরকার অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অর্থনীতির চাবিকাঠির ক্ষেত্রগুলোতে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে অর্থ বরাদ্দ করেছে যাতে এর গুণিতক প্রভাব বা multiplier effect পড়ে অর্থনীতিতে যা ভবিষ্যতের নিরবচ্ছিন্ন আর্থিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। একটা ছোট উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। ধরা যাক আয়ুষ্মান ভারত যোজনার আওতাভুক্ত পরিবারগুলি আগের তুলনায় অর্থনৈতিক ভাবে সুরক্ষিত অনুভব করতে পারছে। এর ফলে যে পরিবারগুলি আগে চিকিৎসার ব্যয়বাহুল্যের কারণে সাধ্যমত অর্থ সঞ্চয় করে রাখতো তারা আজ সেই অর্থ ব্যয় করছে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী ক্রয় করতে যা বাজারে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতেও সাহায্য করছে। এরকম বহু ক্ষেত্রেই সরকারী সহায়তায় প্রান্তিক মানুষেরা আর্থিক নিরাপত্তার সুযোগ

কাজে লাগিয়ে নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে যেমন পূরণ করছে তেমনই দেশের আর্থিক বৃদ্ধিতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বস্তুত সরকারের এই যথোপযুক্ত নীতির ফলে গত দশ বছরে ২৫ কোটি মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র থেকে মুক্তি লাভ করেছে। অথচ সরকারী সহায়তার এই বিপুল ব্যয়ভারের পরেও আর্থিক ঘাটতি ক্রমশই নিম্নগামী হচ্ছে।

এটা সম্ভব হয়েছে মূলত দুটো কারণে। প্রথমত সরকারী এই সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে প্রযুক্তি নির্ভর এক ব্যবস্থার ফলে যেখানে সরকারী অনুদান সরাসরি উপকৃতের ব্যাঙ্ক খাতায় চলে যায়, অর্থাৎ Direct Benefit Transfer বা DBT-এর ফলে আর্থিক তছরুপ বহুলাংশে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। দেশের ২.৭ লক্ষ কোটি টাকা সরকার নয়ছয় হওয়া থেকে বাঁচাতে পেরেছে। অন্যদিকে আয়কর ও জিএসটির ক্ষেত্রে প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন সংস্কারের ফলে সরকারের আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। স্বয়ং অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশের সময় ঘোষণা করেছেন যে গত দশ বছরে আয়কর আদায় দ্বিগুণের বেশী হয়েছে। একই ভাবে জিএসটি আদায়ও বেড়েছে বিপুল পরিমাণে। ফলে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সুন্দর ভারসাম্য বজায় রাখা যাচ্ছে সহজেই। ঘাটতি কম হলে একদিকে সরকারের ওপর ধার-দেনা করার চাপ যেমন কমবে তেমন অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতির হারকেও নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

এখন এক নজরে দেখা যাক এই বাজেটে কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা এনেছেন অর্থমন্ত্রীঃ-

১. পরিকাঠামো উন্নয়ন : গত এক দশকে সরকার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সচেতন প্রয়াস করেছে। যার ফলস্বরূপ বিমানবন্দর, জাতীয় সড়ক, সেতু নির্মাণ, সমুদ্র বন্দর নির্মাণে নতুন নতুন রেকর্ড গড়া হয়েছে। গত চার বছরে পরিকাঠামোর এই বৃদ্ধির গুণিতক প্রভাব পড়েছে দেশের অর্থনীতিতে। এবারের বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ১১.১% যা জিডিপির ৩.৪%। মোট বরাদ্দ হয়েছে ১১.১ লক্ষ কোটি টাকা, যা সর্বকালীন সর্বোচ্চ।

২. রেলপথ : গত এক দশকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করার পথ থেকে সরে এসে প্রকৃত পরিষেবামূলক একটা ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারতীয় রেলের গঠনগত সংস্কার করা হয়েছে। এখন কেন্দ্রীয় বাজেটের সঙ্গেই রেল বাজেটকে যুক্ত করা হয়েছে। কিছু বিশেষ বিশেষ এলাকায় নতুন নতুন ট্রেন ঘোষণা করে সস্তার রাজনৈতিক ফায়দা তোলা নয় এখন বাজেটের মূল লক্ষ্য হয় রেলকে পরিকাঠামো উন্নয়নের হাতিয়ার করে তোলা। সেই নিরিখে এবারের বাজেটে ৪০,০০০ সাধারণ বগিকে বন্দে ভারতের বগিতে পরিবর্তিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বলাই বাহুল্য এর ফলে গোটা দেশ জুড়ে বন্দে ভারত ট্রেনের পরিষেবা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাবে। এতে যেমন যাত্রী সুবিধা বাড়বে তেমনই যাতায়াতের সময় কমার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হবে। এছাড়াও তিনটি মুখ্য রেল করিডোর তৈরীর ঘোষণাও করা হয়েছে। বন্দরগুলো যুক্ত করার করিডোর, জ্বালানী, খনিজ আর সিমেন্টের করিডোর এবং উচ্চ ট্রাফিক ঘনত্বের করিডোর। এর ফলে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক করিডোর তৈরী হবে যা লজিস্টিক খরচ কমিয়ে আর্থিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে তেমন অন্যদিকে যাত্রীবাহী ট্রেনগুলোর সুরক্ষা ও দ্রুততা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রজেক্ট যেমন মেট্রো রেল, নমো ভারত ইত্যাদি এবার অন্যান্য শহরেও বিস্তারিত হবে।

৩. বৈদ্যুতিকরণ : রুফটপ সোলার প্যানেল বসিয়ে ১ কোটি পরিবারে সৌরশক্তির বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে যেখানে ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এর ফলে পরিবারগুলি বছরে ১৫ থেকে ১৮ হাজার টাকা সাশ্রয় করতে পারবে। উপরন্তু বাড়তি বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থাকে বিক্রি করতেও পারবে।

৪. পরিবেশ সহায়ক গ্রিন এনার্জি : ২০৭০ পর্যন্ত দূষণ শূন্য করার লক্ষ্য পূরণ করতে -

ক) উপকূলীয় বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ১ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন।

খ) ১ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লা গ্যাসীয়করণ ও তরলীকরণের ব্যবস্থা ২০৩০ সাল পর্যন্ত তৈরী করা হবে।

গ) বায়োগ্যাস ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ধাপে ধাপে মিশ্রণ করা হবে।

ঘ) এছাড়াও ইলেকট্রিক ভেহিকেল ইকোসিস্টেম বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগের উৎসাহ ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই বাজেটে।

৫. পর্যটন : রাজ্যগুলোকে তাদের আইকন পর্যটন কেন্দ্রকে ব্র্যান্ড ও মার্কেট করার জন্য

উৎসাহিত করা হবে। এর জন্য রাজ্যগুলোকে সুদ মুক্ত দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হবে। লাক্ষাদ্বীপ সমেত অন্যান্য দ্বীপগুলোতে বন্দর যোগাযোগ ও পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য যোজনা গ্রহণ করা হবে।

৬. বিনিয়োগ : ২০১৪-২৩ পর্যন্ত ভারতে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা Foreign Direct Investment (FDI) হয়েছে ৫৯৬ বিলিয়ন ডলার যা ২০০৫-১৪ -এর বিনিয়োগের দ্বিগুণ। FDI আরও বৃদ্ধির জন্য সরকার বিদেশী বিনিয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে FDI অর্থাৎ First Develop India -এই মানসিকতা নিয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করবে।

৭. প্রযুক্তি : এই নতুন প্রযুক্তির যুগে তথ্য ও প্রযুক্তি মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। আজ প্রযুক্তির কল্যাণে নতুন আর্থিক সুযোগ ও সুবিধা কম খরচে সহজলভ্য হয়েছে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও গবেষণার জন্য বেসরকারী সংস্থাকে ৫০ বছরের মেয়াদে সূদ বিহীন ঋণ প্রদান করা হবে। এছাড়াও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উচ্চ প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতা গড়ে তুলতে নতুন যোজনা গ্রহণ করা হবে।

৮. আয়ুষ্মান যোজনা : এবার থেকে অঙ্গনবাড়ী ও আশাকর্মীরাও আয়ুষ্মান যোজনার সুবিধা ভোগ করবেন।

৯. প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা : সবার মাথার ওপর ছাদ তৈরী করতে ২০১৫ সালের ২৫ জুন থেকে আবাস যোজনার মাধ্যমে পাকা ঘর তৈরীর কাজ শুরু হয়। এখন পর্যন্ত প্রায় ৩ কোটি পাকা ঘর গড়ে তোলা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে আরও ২ কোটি ঘর তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রান্তিক মানুষদের যেমন মাথার ওপর ছাদ আসবে তেমনই সিমেন্ট, গৃহঋণ, ইস্পাত ও পেন্টের শিল্প অনেক সুবিধা পাবে।

১০. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে বিশ্বের প্রতিযোগিতায় উপযুক্ত করে তুলতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী। এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য সরকার আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে কাজ করবে। Skill India মিশনে ১.৪ কোটি যুবদের প্রশিক্ষণ ও ৫৪ লক্ষ যুবদের পুনরায় প্রশিক্ষণ এবং ৩০০০ নতুন আইটিআই গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে মেক ইন ইণ্ডিয়ার স্বপ্ন পূরণ হতে শুরু করেছে। এর ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রের অবদানকে বর্তমানে জিডিপির ১৭% থেকে বাড়িয়ে ২০৪৭ সাল পর্যন্ত ২৫% করা সম্ভব হবে।

১১. কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ : বর্তমান সরকারের চোখে কৃষক আমাদের অন্নদাতা। প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্পদ যোজনা ৩৮ লক্ষ কৃষিজীবী উপকৃত হয়েছে এবং ১০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises যোজনায় ২.৪ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান করেছে। ফসল পরবর্তী ক্ষতি কমাতে ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে গ্রহণ করা হচ্ছে নতুন যোজনা।

১২. 'লাখপতি দিদি' যোজনা : অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে ৮৩ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অন্তর্গত ৯ কোটি মহিলা, সশক্তিকরণ ও স্বনির্ভরতার মধ্য দিয়ে গ্রামের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট বদলে দিয়েছেন। তাঁদের সাফল্য এক কোটি মহিলাদের 'লাখপতি দিদি' হতে সাহায্য করেছে। এদের সাফল্যের ফলে 'লাখপতি দিদি'র লক্ষ্যমাত্রা ২ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি করা হয়েছে। এর ফলে গ্রামে মহিলাদের আর্থিক অবস্থার যেমন উন্নতি হবে তেমনই গ্রাম থেকে আর্থিক চাহিদা বৃদ্ধি করবে এবং ক্ষুদ্র ঋণদাতা সংস্থাকে সুবিধা দেবে।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো থেকে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে এই বাজেট বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটা সুনির্দিষ্ট পথ তৈরী করবে। নারী, যুবা, গরীব পরিবার এবং অন্নদাতাদের সশক্তিকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ ভারত গড়ে উঠবে এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

অস্বস্তিতে তৃণমূল সরকার

প্রায় ২ লাখ কোটি টাকার নয়ছয়, উল্লেখ ক্যাগ রিপোর্টে

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

ক্যাগ রিপোর্ট সামনে আসতেই অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১১-২০১২ সাল পর্যন্ত ৩৪ হাজার ৮৮০ কোটি টাকার খরচের শংসাপত্র জমা দেওয়া হয়নি। বাকি ১ লাখ ৯৪ হাজার কোটি টাকার বেশি খরচের শংসাপত্র মেলেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায়।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে এবার দুর্নীতির অভিযোগ ক্যাগের রিপোর্টে। এতদিন যা বিজেপি কর্মীদের দাবি ও প্রান্তিক মানুষজনের ক্ষোভের প্রতিফলনে উঠে আসত, তাতেই কার্যত সিলমোহর দিল ক্যাগের রিপোর্ট। ক্যাগের ওই রিপোর্ট সামনে আসতেই বেশ অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। দুর্নীতিকে কার্যত সরকারি নীতি বানিয়েছে তৃণমূল সরকার। ক্ষমতায় আসার দশ বছর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় অনুদানের ১ লাখ ৯৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচের কোনও হিসাব জমা দিতে পারেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। এমনটাই উঠে এসেছে ক্যাগ (CAG) রিপোর্টে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ক্যাগ রিপোর্ট সামনে আসতে এটা পরিষ্কার হল যে কেন্দ্রীয় অনুদান কীভাবে নয়ছয় করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার।

টাকা নয়ছয় তৃণমূল সরকারের

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ক্যাগ রিপোর্টে ২০০২-২০০৩ সাল থেকেই খরচের শংসাপত্র না মেলার কথা রয়েছে। অর্থাৎ বাম জমানা থেকেই এই টাকা নয়ছয় এর বিষয়টি পরিষ্কার। অর্থাৎ পূর্বতন সরকারও যে দুর্নীতির ভিতের ওপরে দাঁড়িয়েছিল তা স্পষ্ট হল। দিল্লিতে পাশাপাশি বসে রাজ্যে যে বাম নেতারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করার ভান করে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তাদেরও এই রিপোর্ট নিশ্চিতভাবে পড়া দরকার। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, ২০২১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় অনুদানের ২ লাখ ২৯ হাজার ৯৯ কোটি টাকার খরচের শংসাপত্র জমা দেয়নি। এই রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১১-২০১২ সাল পর্যন্ত ৩৪ হাজার ৮৮০ কোটি টাকার খরচের শংসাপত্র জমা দেওয়া হয়নি। বাকি ১ লাখ ৯৪ হাজার কোটি টাকার বেশি খরচের শংসাপত্র মেলেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায়।

কী বলছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিক?

এনিয়ে অর্থ মন্ত্রকের এক শীর্ষ আধিকারিক এর দাবি, "এই রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট, আগের সরকারের দোহাই দিয়ে কোনও ভাবেই বর্তমান সরকার এর

দায় এড়াতে পারে না। কারণ যে টাকা খরচের হিসাব মেলেনি, তার সিংহভাগ অর্থই বর্তমান সরকারের আমলে খরচ হয়েছে। বিশেষত ২০১৮-২১, এই তিন বছরে।"

তৃণমূল সাংসদকে ক্যাগ রিপোর্ট পড়তে বলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী

চলতি বছরে রাষ্ট্রপতি বক্তৃতার পরেই বাজেট অধিবেশনে রাজ্যের বকেয়া প্রসঙ্গ তুলেছিলেন তৃণমূলের সাংসদ সুদীপ বন্দোপাধ্যায়। বকেয়া বললে ভুল হবে, তা হল অযৌক্তিক দাবি। একদা সারদা কেলেঙ্কারিতে জেলে যাওয়া উত্তর কলকাতার সাংসদের এমন ভিত্তিহীন দাবির উত্তর দেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সংসদে সে সময় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে (সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়) ক্যাগ রিপোর্ট পড়তে বলেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যাগ রিপোর্টেই তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির প্রমাণ রয়েছে। বাজেট অধিবেশনের পরেই ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে বিজেপি নেতারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সাংবাদিক বৈঠক করেন। ক্যাগ রিপোর্টকে হাতিয়ার করে বিবৃতি এসেছে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনেরও। তিনি বলেন যে জনগণের প্রাপ্য টাকা কাদের হাতে যাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যাচ্ছে দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে অর্থমন্ত্রী পর্যন্ত আজ কতটা চিন্তিত হয়ে উঠেছেন পশ্চিমবঙ্গের এমন হাল দেখে।

অস্বস্তিতে তৃণমূল সরকার

প্রসঙ্গত, রাজ্যের বকেয়া দিতে হবে, এই দাবিতে গত বছরের অগাস্ট মাস থেকেই দিল্লিতে গিয়ে নাটক শুরু করেন অভিষেক ও তাঁর দলবল। সেখানে বেআইনি ভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দফতরে ধর্নায় বসে পড়েন। শুধুমাত্র মিডিয়া হাইপের জন্য পরবর্তীকালে রাজভবনের সামনেও তাঁদেরকে ধর্নায় দেখা যায়। বর্তমানে কলকাতাতেও মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে গত সপ্তাহেই শেষ হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্না (প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত)। কিন্তু এরই মাঝে এই ক্যাগ রিপোর্ট সামনে আসতেই অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারনা, দুর্নীতি ইস্যু থেকেই দৃষ্টি ঘোরাতে এমন ধর্না কর্মসূচি নিতে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল নেতৃত্বকে। গত বছরের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতায় আসেন। ধর্মতলায় তাঁর জনসভার সময়ই তৃণমূল সুপ্রিমোর নেতৃত্বে বিধানসভায় কালো পোশাক পরে ফের এক প্রস্থ নাটক শুরু করে শাসক দলের বিধায়করা। ক্যাগ রিপোর্ট ভুল এমন হাস্যকর দাবিও শোনা গিয়েছে তৃণমূলের তরফে।

ক্যাগ রিপোর্টে আরও একটি বিষয় সামনে এসেছে যে ২০১৮ সাল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার ৩,৪০০ কোটি টাকার বিল জমা দেয়নি। কীভাবে সেই অর্থ খরচ হয়েছে তার কোনও উত্তর মেলেনি। শিক্ষা থেকে গ্রামোন্নয়ন সব দফতরে দুর্নীতি হয়েছে। গ্রামীণ বিকাশ, নগর উন্নয়ন ও শিক্ষা দফতরে সব চেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে। অনেকেই এখন বলতে শুরু করেছেন "বাংলায় যা হয়েছে, তা মাদার অব অল স্ক্যাম।" কংগ্রেসের মনমোহন সিং সরকারের আমলে যে টু জি স্ক্যামের অভিযোগ উঠেছিল, তার সঙ্গেও বাংলার তুলনা চলছে এখন।

পাটলিপুত্রে পালাবদল

ভারতীয় রাজনীতির গতিপথ নিশ্চিত করল বিহার

সৌভিক দত্ত

উপায় ছিলনা নীতীশের। বুঝতে পেরেছিলেন তাঁকে সামনে রেখে খেলছে কংগ্রেস-লালুপ্রসাদ এবং ২০২৪-এ কেন্দ্রে বিজেপির ক্ষমতায় আসা নিশ্চিত। শেষমুহূর্তে তাঁর বেরিয়ে আসায় ভেস্তে গেল লালু-মমতা-সীতারাম-রাহুলদের স্বপ্নের ঘোঁট। ইন্ডি-র এখন হাতে হ্যারিকেন। চোখে সর্ষেফুল।

বিহার - সেই মহাভারতের আমল থেকেই ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। মগধরাজ জরাসন্ধ একপ্রকার সারা ভারতের বেনামী শাসকই ছিলেন, যাকে হত্যা করে ক্ষমতার কেন্দ্র হস্তিনাপুরে স্থানান্তরিত করেন কৃষ্ণ। পরবর্তীতে কিছু সময় ম্লান থাকার পরে মহাজনপদের আমলে আবারও পুরনো গরিমায় জেগে ওঠে বিহার (মগধ) আর এই মগধের হাত ধরেই ভারতের ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যের যুগের সূচনা হয়। এবং পরবর্তী কয়েক শত বছর ধরে বিহারের মাটি থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয় ভারতবর্ষের ভাগ্য! আমাদের ঘরের ছেলে মহাপদ্মনন্দও তার রাজধানী বিহারের মাটিতে রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন এর ভৌগলিক গুরুত্বের কথা ভেবে। যদিও সেই যুগে আসলে বাংলা আর বিহার আলাদা সত্তা ছিল কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিক মতবিরোধ আছে। অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্রের মত অনেকেই একে বৃহৎ বঙ্গের মধ্যে রাখতে চান। তবে বর্তমানের প্রশাসনিক বিভাজনের হিসাবে বলা চলে, ভারতের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বিহার রাজ্যটির ঐতিহ্য বহু বহু প্রাচীন। এবং এবারও তার ব্যতিক্রম হল না।

ভারতে হিন্দুত্ববাদী তথা জাতীয়তাবাদী শক্তির পুনরুত্থানের সাথে সাথেই মৃত্যুভয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে এতদিনের কায়েমি স্বার্থগুলি। বিচ্ছিন্নতাবাদ হোক বা পরিবারতন্ত্র, জাতের রাজনীতি হোক বা দুর্নীতি - সবাই বুঝে গেছে তাদের শেষ সময় আসন্ন। আর সেইজন্যই বাঁচার শেষ চেষ্টা হিসাবে নিজেদের সব স্বার্থ-দ্বন্দ্ব ভুলে একসাথে এসেছে একে অপরের। মানুষকে ভুল বোঝানোর জন্য রাজনৈতিক জোটের নাম দিয়েছে দেশের নামে আর কালনেমির লঙ্কাভাগের মতো সবাই স্বপ্ন দেখছে নরেন্দ্র মোদিকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার হাসিল করার! আর এই জোট তৈরী হওয়া ও (প্রায়) ভেঙ্গে যাওয়া - দুইএরই পিছনে রয়েছে এই বিহারই!

এমনিতেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে খুব একটা নীতিবাগীশ কেউ বলবে না। ক্ষমতায় থাকার জন্য যে কারও সাথে জোট করতে তার বাঁধে না। তবে হ্যাঁ, লোকটার রাজনৈতিক কৌশল অবশ্যই দুর্দান্ত! কোনবারই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়েও যেভাবে কখনো এই দল আবার কখনো ওই দলকে হাত করে ক্রমাগত মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছেন - তা অবশ্যই রাজনীতির

পাঠ্য হতে পারে। আর হ্যাঁ, তাঁর শাসনে বিহার অন্ততপক্ষে লালুর জঙ্গলরাজের থেকে যথেষ্ট ভালো ছিলো, এটা না বললে অবশ্যই অন্যায় হয়।

এই ক্ষমতালোভী নীতীশ কেই প্রধানমন্ত্রী বানানোর লোভ দেখিয়ে গাছে তুলে দিয়েছিলেন তারই প্রতিদ্বন্দ্বী পশুখাদ্য কেলেংকারী খ্যাত লালুপ্রসাদ। রাজনীতির ময়দানেও লালুও কম পোড়খাওয়া লোক না, আর নীতীশ কী চায় তা তো বিহারের বাচ্চা বাচ্চাও জানে। তাই নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপিকে সরিয়ে ভারত দখল করার কালনেমির লঙ্কাভাগে নীতীশ কে জুটিয়ে নিতে খুব বেশী কষ্ট করতে হয়নি লালুকে। আর এতে সাহায্য করেছিল জেডিইউয়ের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি লালন সিং। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর নীতীশ বিজেপির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দুইবারও ভাবেননি তখন। সাথে রাজ্যেও ক্ষমতায় এনেছিলেন জঙ্গলরাজের কারিগর লালুর দল আরজেডিকে।

কিন্তু নীতীশের মোহ কেটেছিল ইন্ডি জোটে যোগ দেওয়ার পরে। শোনা যায় জোটের দ্বিতীয় বৈঠকের সময়েই নাকি নীতীশ বুঝে গিয়েছিলেন যে তাঁকে বোকা বানিয়ে ব্যবহার করছে লালু আর কংগ্রেস! বেঙ্গালুরুতে দ্বিতীয় বৈঠক চলাকালীন বেঙ্গালুরুর রাস্তায় নীতীশের বিরুদ্ধে পোস্টার এবং হোর্ডিং পড়েছিল। বৈঠকে আহ্বায়ক হিসেবে নীতীশের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি এই বৈঠকে রাহুল গান্ধীকেই জোটের নেতৃত্ব দিতে বলেছিল লালুপ্রসাদ। ফলে সেইদিনই যা বোঝার বোঝা হয়ে যায় নীতীশের! ভদ্রলোক লোভী হলেও নির্বোধ নন। তাই এরপরেই অশোক চৌধুরী, সঞ্জয় ঝা এবং বিজয় চৌধুরীকে নিয়ে শুরু হয় ভুল সংশোধনের চিন্তাভাবনা! নীতীশ কুমার বুঝে গিয়েছিলেন যে এই মূহুর্তে তার জন্যে মোদি ছাড়া গতি নেই। মারলে বিজেপিই মারবে, বাঁচালে বিজেপিই বাঁচাবে।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে আলোচনারত নীতীশ কুমার।

তাই সেপ্টেম্বর নাগাদই শুরু হয়ে যায় বিজেপির সাথে গোপন যোগাযোগ, নেতৃত্বে সঞ্জয় ঝা। এমনকি এই কাজে নীতীশ এতটাই মরিয়া ছিলেন যে লালু ঘনিষ্ঠ লালন সিংকেও সর্বভারতীয় সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। জেডিইউয়ের জাতীয় পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের বৈঠকও পাটনায় না ডেকে দিল্লিতে ডাকা হয় লালু প্রসাদের খপ্পর এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে! কিছু বিধায়কের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করে তাদের মন পরীক্ষাও করেছিলেন অশোক চৌধুরী। তবে আসন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে তাদের কিছুই জানানো হয়নি।

ক্রমাগত বিজেপির কাছে দেনদরবার ও লালন সিং এর অপসারণ অমিত শাহেরও মন নরম করে। তাছাড়া ইন্ডি জোট ভাঙ্গাটাও গুরুত্বপূর্ণ! তাই সবুজ সংকেত আসে বিজেপির তরফ থেকেও। লালন সিং-এর অপসারণের পরই, বিহার বিজেপির সভাপতি সম্রাট চৌধুরীকে ডেকে জেপি নাড্ডা এবং অমিত শাহ বলেছিলেন নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে খুব বেশি আক্রমণাত্মক না হতে। এমনকি উদ্ভুত জটিলতা এড়াতে প্রধানমন্ত্রী মোদিও পরপর দুবার বিহার সফর বাতিল করেন। কারণ সেখানে নীতীশের বিরুদ্ধে কিছু বললে তা অপারেশন বিহারের ক্ষতি করতে পারে আবার কিছু না বললে তা লালুর সন্দেহ ঘটাতে পারে। তাই সমস্যা না বাড়িয়ে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। জোটের চতুর্থ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরবিন্দ কেজরীওয়াল মল্লিকার্জুন খাড়্গের নাম প্রস্তাব করলে প্রকৃতপক্ষে ইন্ডি জোটের কফিনে শেষ পেরেক ঢোকে। লালুও সেই প্রস্তাবে নীরব সম্মতি দেয়। নীতীশ ও স্পষ্ট বুঝে যান যে এতদিন তাঁকে নিয়ে বাঁদর নাচ নাচিয়েছে তাঁর তথাকথিত রাজনৈতিক বন্ধুরা। ফলে বদলা নেওয়ার জন্য রাম মন্দিরের বিরুদ্ধে আরজেডি-র বক্তব্যের কড়া জবাব দেয় জেডিইউ। পাশাপাশি, শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে সমস্ত সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে তেজস্বীর মুখ সরাতে শুরু করেছিল নীতীশ সরকার। চন্দ্রশেখরকেও শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি ২৪ জানুয়ারি কর্পুরী ঠাকুরের জন্মশতবর্ষে, পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণে নামেন নীতীশ । আর কে না জানে ভারতে পরিবারতন্ত্রের ধ্বজাধারী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অন্যতম হল লালুর দল। প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রশংসাও করেন এদিন নীতীশ।

আসলে ইন্ডি জোটের যে কোনো ভবিষ্যত নেই তা ভালোই বুঝেছিলেন নীতীশ । বুঝেছেন যে তাঁর সময় শেষ আর বিহারে বিজেপির ক্ষমতায় আসা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। এই পরিস্থিতিতে জঙ্গলরাজখ্যাত লালুর হাত ধরে জীবনের শেষ ইনিংস খেলা নীতীশের জন্যেও খুব একটা ভালো হত না। নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে ক্ষমতা ত্যাগ করলে তাতে নীতীশেরই মুখ উজ্জ্বল হবে। আবার অন্যদিকে বিজেপিরও নীতীশকে প্রয়োজন ছিলো। ইন্ডি জোট ভাঙ্গা তো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তবে এছাড়াও পশ্চাৎপদ এবং অত্যন্ত পশ্চাৎপদ মানুষদের মধ্যে যে লালু-বিরোধী ভোট রয়েছে, তা নীতীশকে দিয়ে ঘরে তোলার কৌশল তৈরি করেছে বিজেপি। নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারে বিজেপি থেকে তিন জন শপথ নিয়েছেন– সম্রাট চৌধুরী, বিজয়কুমার সিনহা ও প্রেম কুমার। এর মধ্যে বিজেপি রাজ্য সভাপতি ও বিধান পরিষদ সদস্য (এমএলসি) সম্রাট চৌধুরীকে বিজেপির আইনসভা দলের নেতা নির্বাচিত করা হয়েছে, যা তাঁর বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পথ প্রশস্ত করেছে। এই শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা!

সব মিলিয়ে বলা যায় আবারও একবার ভারতের রাজনীতিকে পথ দেখালো বিহার! নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপি যে এই মূহুর্তে বিকল্পহীন তা মানুষ বুঝতে পারছে বিহার কান্ড থেকে। স্বার্থ থেকে উৎপন্ন ইন্ডি জোটের কফিনও বলতে গেলে পোঁতা হয়ে গেল বিহারের মাটিতেই। আর খুব তাড়াতাড়ি বিহারে একক শক্তিতে ক্ষমতায় এসে সম্পূর্ণ পূর্ব ভারতকে অপশক্তি মুক্ত করার কাজে নামতে পারবে বিজেপিও। যা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র!

অপদার্থ মমতা সরকার

তেলা মাথায় তেল দেওয়া রাজ্য প্রশাসন

নারায়ণ চক্রবর্তী

অপদার্থ। মমতা সরকারের অপদার্থ দলদাস পুলিশ ও প্রশাসন। একটি সরকার অপদার্থ হতে পারে; স্বৈরাচারী হতে পারে; আবার দুর্নীতিগ্রস্ত হতে পারে। কিন্তু একসঙ্গে তিনগুণের সমাহার হলে জনবিক্ষোভ যে কোন সময় আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ খুলে দিতে পারে।

এ কথা ঠিক যে নির্বাচনে জয়লাভ করলে দেশের শাসন ক্ষমতা পাওয়া যায়! যদিও এই ক্ষমতা কিন্তু absolute নয় - তার সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা আছে। সেজন্য আমাদের সংবিধানপ্রদত্ত নিয়মে শাসকের শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি না থাকলেও 'বোধ' থাকা অত্যন্ত জরুরী। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই 'বোধ' নিয়ে নির্বাচকদের অবিবেচক আচরণের প্রভাব পড়েছে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায়।

এই মূহুর্তে বর্তমান রাজ্য সরকারের পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রাজনৈতিক দলের কব্জায় রাজ্যের প্রশাসন ও পুলিশ! এ অবস্থা দীর্ঘদিন চলায় কালের নিয়মে যেমন শাসকদলের দুর্নীতি উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। এমনকি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শাসকদলের যে সব নেতারা তাঁদের দলের কাজকর্ম সমর্থন করতে বসেন, তাঁরা পর্যন্ত দলের কাজ সমর্থনের ভাষা খুঁজে না পেয়ে অন্য রাজ্যে বা এই রাজ্যে তাঁদের আগের শাসনকালের ইতিহাস বলতে শুরু করেন! কোনও কারণে চ্যানেল টিআরপি হারালে রাজ্য সরকার বিজ্ঞাপন দিয়ে তা পুষিয়ে দেন! এভাবে রাজ্যে 'অনুপ্রেরণা 'য় অনুপ্রাণিত প্রশাসন, অনুপ্রাণিত পুলিশ এবং অনুপ্রানিত সংবাদমাধ্যম - সকলে মিলে "সব ঠিক আছে" বলে প্রচার করলেও জনসাধারণের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। এই সরকার রাজ্যের সব মানুষের সরকার না হয়ে শুধু তাঁদের দলের সরকার হিসেবে কাজ করছে! দেশের অন্য কোন রাজ্যে না হলেও এই রাজ্যে শাসকদলের নেতাদের ভাষায় "উন্নয়ন" রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে! উন্নয়নের জোয়ারে "গুড় বাতাসা" সহযোগে বিরোধী রাজনৈতিক দলকে উড়িয়ে দেওয়াই নয়, জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা, চাওয়া-পাওয়া - সব কিছুকেই ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এখানে একমাত্র 'অনুপ্রেরণা 'র ইচ্ছেয় তাঁর মত করে উন্নয়নের ঘোড়া ছোটানোর প্রচার হয়!

ফলে শাসকদলের বরিষ্ট মন্ত্রী, নেতা সহ বহু উন্নয়নের কাণ্ডারি দুর্নীতির অভিযোগে জেলবন্দী! এমনকি "গুড়-বাতাসা" ও "পুলিশকে বোম মারুন" এর প্রবক্তা দোর্দন্ডপ্রতাপ এক জেলা সভাপতি সকন্যা জেলের ভাত খাচ্ছেন! আরো অনেক নেতা-নেত্রী আদালতের রায়ে অনুসন্ধানরত কেন্দ্রীয়

তদন্তকারী সংস্থাদ্বয়ের জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হচ্ছেন। 'অনুপ্রেরণা' সহ সব নেতা-নেত্রীর এক রা - সব নাকি রাজনৈতিক চক্রান্ত! আদালতের নির্দেশে বিশেষভাবে আদেশ পাওয়া কেন্দ্রীয় সংস্থাদ্বয় তদন্ত অনুসন্ধান করছে। Prima face প্রমাণে গ্রেফতার হচ্ছে। এক সত্তরোর্ধ নেতা তাঁর কন্যার চেয়ে কম বয়েসী 'বান্ধবী'সহ জেলে আছেন! দলটির পুরোনো দেওয়াল লিখন - সততার প্রতীক - এখন শতাব্দীর সবচেয়ে বড় পরিহাস! এভাবে দুর্নীতির পাঁকে ডুবে যাওয়া একটি দল যখন দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকে, তাঁদের প্রথম লক্ষ্যই হয় প্রশাসনকেও দুর্নীতিগ্রস্ত বানানো। তাহলে সেই প্রশাসন দলের নেতৃত্বের প্রতি অনুগত হয়। একই সঙ্গে পুরস্কার-তিরস্কার নীতির প্রয়োগে পুলিশের মেরুদন্ড বিকিয়ে দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

যেখানে রাজ্যের উন্নয়নের মানদন্ড হচ্ছে বিভিন্ন "শ্রী" এবং "ভান্ডার" প্রকল্প, যার পিছনে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে এবং ভুয়ো অ্যাকাউন্টে যেমন ১০০ দিনের কাজে টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ আছে, তেমনি এইসব "শ্রী" - "ভান্ডার" প্রকল্পেও সে সুযোগ আছে। আবার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা না দিলেও রাজ্য সরকার প্রশাসনের ডব্লিউবিসিএস, ভব্লিউ বিপিএস, আইএএস এবং আইপিএসদের স্পেশাল পে-র নামে অ্যাডহক বেতন বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছে! আইএএস ও আইপিএসরা রাজ্য সরকারের চাকরি করলেও তাঁদের বেতন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সুবিধা (ডিএ, বাড়িভাড়া ভাতা ইত্যাদি) কেন্দ্রীয় হারেই পান। সেজন্য তাঁদের পক্ষপাতমূলক পরিচালনায় সদ্য অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিডিও ও কিছু এসডিওর কাজকর্ম আদালতে নিন্দিত হয়েছে যা ভর্ৎসনারই শামিল।

ফলশ্রুতিতে পুলিশের মানসিকতার পরিবর্তন তাঁদের কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। কিছুদিন আগে এক সকালে বেহালা চৌরাস্তার বড়িশা হাইস্কুলের সামনে একটি মাটি বোঝাই লরি ঐ স্কুলের ৭ বছরের খুদে পড়ুয়া সৌরনীল সরকারকে চাপা দেয় এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ছেলেটির বাবা গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এটা হয়ত সাধারণ একটি দুর্ঘটনা মনে হতে পারত! কিন্তু পরবর্তী সময় পুলিশের হস্তক্ষেপ ও তাঁদের কাজ অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়!

প্রথমতঃ, ঘাতক লরিটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়! প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, এই সময় ট্রাফিক সামলানোর দায়িত্বে থাকা পুলিশ নাকি লরি

জনতার ক্ষোভের প্রকাশ।

ছাত্র মৃত্যুর পর পুলিশের বিরুদ্ধে জনতার ক্ষোভ।

ড্রাইভারের থেকে টাকা নিয়ে গাড়িটি ছেড়ে দিয়েছে। এমন অভিযোগ গুরুতর। তবে এই ঘটনার পর উপস্থিত জনতা ফুঁসে ওঠে। তারা মৃতদেহ আটকে বিক্ষোভ দেখায়। তার ফলে ডায়মন্ডহারবার রোডের মত ব্যস্ত রাস্তা তিন ঘন্টার মত বন্ধ থাকে! সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী এই দুর্ঘটনা ও পরবর্তী অশান্তি নিয়ে নাকি কড়া পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেন। দুর্ঘটনা ঘটার পর অশান্তি নিয়ে কড়া পদক্ষেপ মানে মৃতদেহ জোর করে তুলে নিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা! অশান্তি থামাতে কড়া পদক্ষেপ বলতে পুলিশকে প্রতিবাদী মানুষদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া!

বৈদ্যুতিন মাধ্যমে জানা যায়, মৃত ছাত্রটির গুরুতর আহত বাবাকে স্থানীয় মানুষজন কাছের বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যান। তারপর পুলিশ অবরোধ তোলার জন্য টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে! এই সময় বড়িশা স্কুলের ভেতরে, যেখানে ছোট ছাত্রদের রাখা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে পুলিশ টিয়ার গ্যাস চালায়! এমনকি একজন মহিলার মুখে টিয়ার গ্যাসের শেল আঘাত করলে ভদ্রমহিলার মুখে ক্ষতের সৃষ্টি হয়! ঘটনার পর বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী ও ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বক্তব্যের মধ্যে থেকে যে নির্যাস বেরিয়ে এসেছে তা হল, এই একই অঞ্চলে বিত্তশালীদের জন্য যে নামী বেসরকারি স্কুল আছে, তার সামনে যান নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত পুলিশী ব্যবস্থা থাকলেও এই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের জন্য সরকারি স্কুলের সামনে পুলিশের অব্যবস্থার কারনে ঐ স্কুলের ৭ বছরের শিশুর প্রাণ অকালে ঝরে গেল। এখানে একটি প্রশ্ন - যে পুলিশ 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' সপ্তাহ চলাকালীন বড়িশা হাইস্কুলের সামনে দুর্ঘটনায় ছাত্রমৃত্যুর পর স্কুলের ছাত্রদের উপর টিয়ার গ্যাস চালাতে পারে, তাঁদের কি হিম্মত হবে একই কারনে লা-মার্টস বা বাইপাসের ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্রদের উপর টিয়ার গ্যাস চালানোর? হবে না। কারন এইসব স্কুলে সাধারণ মানুষের সন্তানরা পড়ে না। এখানে টিয়ার গ্যাস ফাটালে পুলিশের বড় কর্তাদের নর্থ বেঙ্গলে বদলি হওয়া কয়েক ঘন্টার ব্যাপার!

হয়ত একটি দুর্ঘটনা মানুষের অসন্তোষের আগল খুলে দিল, তবে এই ধরনের বিক্ষোভ আরো বাড়ছে। একটি সরকার অপদার্থ হতে পারে; স্বৈরাচারী হতে পারে; আবার দুর্নীতিগ্রস্ত হতে পারে। কিন্তু একসঙ্গে তিনগুণের সমাহার হলে জনবিক্ষোভ যে কোন সময় আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ উদ্গীরনের মত আছড়ে পড়তে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এই বিক্ষোভ পুলিশ দিয়ে দমানো যায়নি। দেখা যাক, কোথায় এর শেষ হয়।

হীরক রানির
কুকীর্তি
গল্প হলেও সত্যি

পর্ব – ২

হীরক রানির চাকরি চুরি

ছবিতে খবর

ভারতীয় জনতা পার্টি উপভোক্তা অভিযান বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনে বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

দক্ষিণ কলকাতায় ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য 'দেওয়াল লিখন প্রচারাভিযানে' যুবমোর্চার রাজ্য সভাপতি ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ সহ বিজেপি কর্মীবৃন্দ।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়া বিজেপির নেতা-কর্মীদের নিয়ে স্মারকলিপি দিলেন বিরোধী দলনেতা ও বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে অযোধ্যায় ১০০১ কেজি গোবিন্দভোগ চাল পাঠানোর মুহূর্তে বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার।

রাজ্যে মহিলাদের উপর তৃণমূলের অত্যাচারের প্রতিবাদে বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দলের বিক্ষোভ।

সন্দেশখালি সহ রাজ্য জুড়ে মহিলাদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ, খুনের প্রতিবাদে জেলায় জেলায় রাস্তা অবরোধ এবং থানা ঘেরাও কর্মসূচি।

সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর তৃণমূলের পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে বসিরহাট এসপি অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সহ রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্ব।

পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে টাকির ইছামতী নদীর তীরে সুকান্ত মজুমদারের সরস্বতী পুজো।

টাকিতে মমতার দলদাস পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। হাসপাতালে দেখতে গেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সন্দেশখালিতে তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিজেপির কর্মসূচিতে পুলিশের হাতে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে দেখা করলেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ডাঃ ইন্দ্রনীল খান।

সন্দেশখালি যাওয়ার পথে বাসন্তী হাইওয়ের কাছে বিজেপির পরিষদীয় দলকে পুলিশের বাধা। প্রতিবাদে রাস্তায় বসে বিজেপি বিধায়কদের বিক্ষোভ।

তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সন্দেশখালির জন অভ্যুত্থান।

কলকাতার আন্তর্জাতিক বইমেলায় জাতীয়তাবাদী স্টলে সকলের সঙ্গে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী।

জয়নগর সাংগঠনিক জেলার কুলতলি গ্রামে ভগবান শ্রী রাম চন্দ্রের পুজো ও যজ্ঞানুষ্ঠানে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী।

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় দেশব্রতীদের মুখপত্র ভারতীয় জনবার্তা (সংবাদ পাক্ষিক)-এর উদ্বোধনে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত সিউড়ির লোকগায়ক শ্রী রতন কাহারের সঙ্গে বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

পুরুলিয়া জেলার পাড়া বিধানসভার মঙ্গলদা মৌতোড় অঞ্চলের মাঠে বিশাল জন জাগরণ সভায় সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো।

কোচবিহার উত্তর ও কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের মোট চার শতাধিক সদস্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করল— কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, বিধায়ক শ্রী সুকুমার রায় এবং বিধায়ক শ্রী নিখিলরঞ্জন দে'র নেতৃত্বে।

বালুরঘাট শহরের যুবশ্রী মোড়ে লোকসভা নির্বাচনের দেওয়াল লিখন প্রচারাভিযানে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ বিধানসভায় প্রায় ১০টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করল।

ডায়মন্ডহারবার তপনা প্রাইমারি স্কুল ময়দানে মোদি কাপ ফুটবল ম্যাচে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

বিজেপি তফসিলি মোর্চা আয়োজিত মরিচঝাঁপি দিবস কার্যক্রমে মরিচঝাঁপি দ্বীপে শহীদ তর্পণ করলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা, তফশিলী মোর্চা রাজ্য সভাপতি ডাঃ সুদীপ দাস, বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী, অম্বিকা রায়, বিধায়িকা চন্দনা বাউড়ি সহ বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন বিধানসভার জনসভায় রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

দক্ষিণ বারাসাত বুথ কার্যকর্তা সম্মেলনে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলায় ভারতমাতা পুজোর অনুষ্ঠানে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার-এর উপস্থিতিতে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় আইন অমান্য কর্মসূচিতে মমতার দলদাস পুলিশের অত্যাচারে আহত অনেক বিজেপি কর্মী।

১০ বছরে বিশ্ব অর্থনীতিতে ৫ নম্বরে

মোদির ভারত

সুদীপ্ত গুহ

মোদি সরকারের দশ বছরে কিভাবে পাল্টে গেল আমাদের দেশ? কি কি বিশেষ পদক্ষেপ দেশকে পৃথিবীর পাঁচ নম্বর অর্থব্যবস্থায় নিয়ে গেল? আমাদের উপর রাজত্ব করা ব্রিটেন, ফ্রান্স কিভাবে আমাদের থেকে পিছিয়ে গেল? কেন পৃথিবীর বড় বড় আর্থিক সংস্থা বলছে যে জার্মানি এবং জাপানকে ছাড়িয়ে যাওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র?

২০১৪ সালে যখন মোদিজি প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশের হাল ধরলেন, দেশ তখন বেশ কিছু বড় সংকটের সম্মুখীন। অধিকাংশ পণ্য চিন থেকে আমদানি হত। জ্বালানি, খাবার তেল, ভেষজ উপাদান, সামরিক সরঞ্জাম থেকে ওষুধের পেমেন্ট সিস্টেমসহ এমন কিছু ব্যাপারে আমরা পরনির্ভর ছিলাম, যে আমাদের স্বাধীন বিদেশনীতি, শিক্ষানীতি তো বটেই, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে আমাদের দশবার ভাবতে হত। যেমন কোন মুসলিম দেশ থেকে যদি কোন সন্ত্রাসবাদী হামলা করতো, তাঁদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর পদক্ষেপ নেবার আগে আমাদের বহুবার ভাবতে হত, বাকী মুসলিম দেশগুলির প্রতিক্রিয়া কি হবে সেটা ভেবে। সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হওয়া কোন দেশের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমরা যদি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর নাও হই, কম করে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে বিশ্বের বৃহত্তম শক্তিগুলি যেন কোন না কোন ক্ষেত্রে আমাদের উপর নির্ভরশীল থাকে। নইলে ভূরাজনীতিতে বিশ্বের ছয় ভাগের এক ভাগ মানুষ উপেক্ষিত থেকেই যাবে।

এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধাও ছিল বিস্তর। আমাদের উন্নয়নের পথে অন্যতম বড় যে বাধা ছিল দেশের অধিকাংশ গরীব মানুষ ছিল ব্যাঙ্কিং পরিষেবার বাইরে। এরফলে দেশের ৪০% মানুষ জীবন বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, কৃষি বীমা, চিকিৎসা বীমা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিল। কৃষি বা ক্ষুদ্র ব্যাবসার মূলধনের জন্য তাঁদের নির্ভর করতে হত মহাজনদের কাছে, যা এককথায় মধ্যযুগীয়। পরিকাঠামো উন্নয়ন ছিল দিশাহীন। সড়কপথ, জলপথ,

আকাশপথ, রেলপথকে কিভাবে একটা সংযুক্ত শিল্প এবং বাণিজ্য তথা রপ্তানি করিডোরে পরিণত করা যায়, সেই দিশা ছিল না। উচ্চমানের শিক্ষা শুধুমাত্র ধনীদের জন্য বরাদ্ধ ছিল এবং ছিল কিছু পকেটে। দেশের যুবকদের কিছু বিশেষ ক্ষেত্র, যেমন সফটওয়্যার এবং কিছু পরিষেবা ছাড়া কোন কাজের সুযোগ ছিল না। পণ্য আমদানি খাতে দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল প্রচুর বিদেশী মুদ্রা। ব্যাপারটা এমন যে একটা গ্রামের যুবকযুবতীরা যেই বিষয় নিয়েই পড়াশুনা করুন বা যে কাজেই দক্ষতা অর্জন করুন না কেন, রান্না করা ছাড়া সেই গ্রামে আর কোন জীবিকা নেই। এমন এক পরনির্ভর দেশ কিভাবে উন্নতি করবে? এমন অবস্থায় শুরু হল বিভিন্ন কঠোর আর্থিক, প্রশাসনিক এবং আইনি সংস্কার। আন্তর্জাতিক বাজার তৈরির জন্য শুরু হল বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং দেশের মধ্যে পরিকাঠামোর উন্নতি।

প্রথমে ভাবা যাক আন্তর্জাতিক কূটনীতি। ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর, গুরুত্ব হারাতে থাকলো WTO তথা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, যাদের দৌলতে চিন সহ বিভিন্ন দেশ বেশ কিছু সুবিধা পেত। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক কিংবা এবং কখনো ছোট ছোট গ্রুপ তৈরি শুরু করে বাণিজ্যিক চুক্তি সাক্ষর হল। QUAD (আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারত), I2U2 (ইসরায়েল, আমেরিকা, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী), BRICS (ব্রাজিল, রাশিয়া, চিন, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা), সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (চিন, রাশিয়া সহ কিছু দেশ) থেকে G20 সব গ্রুপেরই অংশ হয় ভারত। সবাই ভারতকে তাঁদের অংশ হিসেবে চাইছে। রাশিয়া, আমেরিকা, চিন, ইরান কিংবা ইউরোপ। সবাই চাইছে মোদিজির ভারতকে কিন্তু কেন? ইরান চাইছে মোদিজির বন্ধুত্ব আবার ইসরায়েলও চাইছে, রাশিয়া মোদিজির হাত ধরতে চায় আবার আমেরিকাও, তুর্কি বিপদে ভারতের সাহায্য চায়, আবার চায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ভারতের সহযোগিতা চায় তাঁদের পরিকাঠামো নির্মাণে। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ চায় ভারত তার অভিজ্ঞতায় ওই দেশের খনি থেকে লিথিয়াম তুলে দিতে সাহায্য করুক। ভারতের তৈরি অস্ত্র কিনে নিজেদের অস্ত্রভান্ডার মজবুত করছে বহু দেশ। মাস্টার, ভিসা বদলে রূপে-কার্ড চাইছে বহুদেশ, swift এর বদলে UPI পেমেন্ট সিস্টেম চাইছে তারা। বাচাতে চাইছে মাস্টার, ভিসা এবং সুইফ্ট এর কমিশন। কোভিডের সময়ে মার্কিন ভ্যাকসিন না নিয়ে ভারতীয় ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছে একশোর বেশী দেশ। মোদিজির পায়ে হাত দিয়ে পর্যন্ত প্রণাম করেছে একজন রাষ্ট্রনায়ক। কিন্তু দশ বছরে কিভাবে পাল্টে গেল আমাদের দেশ? কি কি বিশেষ পদক্ষেপ দেশকে পৃথিবীর পাঁচ নম্বর অর্থব্যবস্থায় নিয়ে গেল? আমাদের উপর রাজত্ব করা ব্রিটেন, ফ্রান্স কিভাবে আমাদের থেকে পিছিয়ে গেল? কেন পৃথিবীর বড় বড় আর্থিক সংস্থা বলছে যে জার্মানি এবং জাপানকে ছড়িয়ে যাওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র?

প্রথমত, দেশের ৪০% মানুষের হাতে ছিল না ব্যাংক একাউন্ট। মোদিজি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে এঁদের দেশের অর্থব্যাবস্থার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করলেন। দেশের দরিদ্রতম মানুষ প্রথমবার জানলো জীবনবীমা, দুর্ঘটনা বীমা, চিকিৎসা বীমা, কৃষি বীমা কি। ব্যাঙ্কিং সার্ভিসের মধ্যে আসায় কম হারের সুদে ধার পেলেন তারা। সঙ্গে রূপে ডেবিট কার্ড, কিষান ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি। বাড়লো ব্যাংকের মূলধন। রূপে-কার্ড প্রতিযোগিতায় ফেলে দিল মাস্টারকার্ড এবং ভিসা কার্ডকে যারা অতিরিক্ত কমিশন নেয় আজও। SWIFT-এর বদলে আনা হল UPI। আগেই বলেছি বিশ্বের বহু দেশ এই UPI ব্যাবহার করছে আজ। ডিজিটাল লেনদেন বৃদ্ধি পাওয়ায় টাকা এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকে থেকে গেল। বাড়লো ব্যাংকের ক্যাপিটাল। আরও কম সুদে দেশবাসী পেতে থাকলো শিল্প, বাণিজ্য, বাড়ী এবং গাড়ীর লোন। চাঙ্গা হল দেশের অথনীতি।

দ্বিতীয়ত, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুরের থেকেও কমিয়ে দেয়া হল কর্পোরেট কর, যাতে চিন থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে কোন দ্বিধা না থাকে চিনের বিদেশী বিনিয়োগকারীর এবং তাঁরা ভারতে ব্যবসা করার ব্যাপারে দুইবার না ভাবে।

তৃতীয়ত, বাড়ানো হল ক্যাপিটাল এক্সপেনডিচার্স। সড়কপথ, জল পথ, রেল পথ, পণ্য পরিবহণ, রেলপথ, নতুন বিমানবন্দর এবং বিভিন্ন স্ট্রাটেজিক বন্দর তৈরি হল রপ্তানির পরিকাঠামোকে আরও সহজ করতে। সাবমেরিন কেবল ল্যান্ডিং স্টেশন থেকে মহাকাশ ক্ষেত্রে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হল যাতে মানুষ আরও কম পয়সায় আরও বেশী ডেটা ব্যাবহার করতে পারে। রেলের ইলেকট্রিফিকেশন বাড়ল বহুগুন। ইন্টারনেট ডেটার দাম কমিয়ে ১০০ ভাগের এক ভাগ করা হল। রিনিউএবল এনার্জির পরিমান বাড়লো। দেশের প্রতিটি জেলাকে প্রতিটি বন্দরের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে বিভিন্ন পরিকাঠামোর মাধ্যমে, যাতে আমদানি/রপ্তানির মাধ্যমে বাড়ানো যায় বাণিজ্য ও কাজের সুযোগ। ইন্টারনেট ডেটার দাম মাত্র কয়েক বছরে ১% হয়ে গেল। আজ মনিপুর, লাদাখ বা কোচবিহারের গ্রামের একটি

ছেলে নিজের বাড়ীতে বসে IIT, NEET অথবা সিভিল সার্ভিসের প্রস্তুতি নিতে পারে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কোটা, হায়দ্রাবাদ বা দিল্লি যেতে হবে না।

চতুর্থত, কালো টাকার অর্থনীতি প্রায় নির্মূল। নোট বন্দি, জিএসটি এবং রেরা আইনের ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষ আজ ক্যাশে ব্যবসা না করে, তাঁদের সঠিক ব্যবসার অংক দেখাচ্ছেন। রেরা আইন আবাসনে নগদ লেনদেন প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের রাজ্যেই দেখা যাচ্ছে, বহু নেতা বেনামে জমি, বাড়ী কিনে ভেবেছিলেন তারা রক্ষা পাবেন। কিন্তু তাঁদের স্থান হয়েছে শ্রীঘরে। মুম্বই, দিল্লির বড় বড় আবাসন কোম্পানি একসময় ৩০% থেকে ৫০% নগদে কিনতে বাধ্য করতেন সাধারণ সৎ নাগরিককেও। আজ তাঁদের বড় অংশ হয় জেলে আছেন, নয় জামিনে। এদিকে আবাসন শিল্পে বিক্রি বেড়েছে বহুগুন। কারণ সৎ মানুষের নাগালে এসেছে আবাসন।

পঞ্চমত, IBC ২০১৬ সংস্কার। গত দশ বছরের সবচেয়ে বড় সংস্কার এই ইনসলভেন্সি এন্ড ব্যাংকরাপসি কোড ২০১৬। ১৯৬৯ সালে ব্যাংক জাতীয়করণ করেন ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু ব্যাংকের হাতে টাকা আদায়ের অস্ত্র তুলে দেননি ইন্দিরাজি। ফলে বড় বড় ব্যাবসায়ীরা ধার নিয়ে টাকা ফেরত দিত না তাঁদের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে। প্রতিবাদ করেন তৎকালীন জনসঙ্ঘের সাংসদ অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং স্বতন্ত্র পার্টির সাংসদ মিনু মাসানিজি। অটলজি প্রধানমন্ত্রী হয়ে ২০০২ সালে সরফেসী (SARFAESI) আইন আনেন। কিন্তু অটলজি চলে যাওয়ার পর আবার নেতাদের ফোনে লোন এবং লোন মুকুবের খেলা চলে। ব্যাংকের লোন বড় ব্যবসায়ী শোধ না করলে, রিজার্ভ ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে ব্যাংকের সেই ক্ষতি পূরণ করতো। এর কেতাবি নাম রিক্যাপিটালাইজেশন। অথচ সাধারণ মানুষ গৃহঋণের কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে, তাঁর বাড়ীর চাবি নিয়ে নিত ব্যাংক। এই পদ্ধতিতে বাড়তো জিনিসের দাম। আমরা ভাবতাম সরকারি ব্যাংকে আমাদের টাকা সুরাক্ষিত। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি আমাদের পকেট থেকে ব্যাংকের এই ক্ষতি মিটিয়ে নিত। এবার মোদিজি আনলেন IBC কোড। তিন মাস ব্যাংকে টাকা বাকী থাকলে শিল্পপতির সব সম্পত্তি বেঁচে সেই টাকা উসুল করবে ব্যাংক। এর পরেই দেখা গেল স্বাধীনতার পর প্রথমবার দেশ থেকে পালালো দেশের তিন বড় শিল্পপতি। অনিল আম্বানি, রুইয়ারা বাধ্য হয় তাঁদের সম্পত্তি বেঁচে টাকা ফেরৎ দিতে। কারণ জুগারের দিন শেষ। কমেছে ব্যাংকের NPA। গতবছর দেশের সব ব্যাংকের মিলিত লাভ এক লক্ষ কোটি ছাড়িয়েছে। আরও বেশী ঋণ পাচ্ছে গরীব কৃষক, মৎসজীবি, হস্তশিল্পী থেকে ছোট ব্যাবসায়ী। আগে এই দরিদ্র শ্রেণী চড়া সুদে বন্ধকের বিনিময়ে মূলধন নিত মহাজনদের থেকে।

ষষ্ঠত, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। ২০১৩ সালে আমাদের মুদ্রাস্ফীতি ছিল দুই অংকে। ইন্দিরা গান্ধী ব্যাংক জাতীয়করণ করার কয়েক বছরের মধ্যে এই হার প্রায় ৩০% হয়েছিল। এর প্রভাব কি? ধরা যাক, জানুয়ারিতে আপনি জানেন আপনার ব্যাংকে ১০০০০ আছে। কিন্তু ডিসেম্বরে এই টাকায় টাকার মূল্য কমে দাঁড়ালো প্রায় ৭৭০০ টাকার সমান। অর্থাৎ আপনার পকেট থেকে ২৩০০ টাকা বেরিয়ে গেল, অথচ, আপনি জানতে পারলেন না। আমাদের মুদ্রাস্ফীতি বরাবার পশ্চিমী দুনিয়ার চেয়ে অনেক বেশী থাকে। আমাদের মুদ্রাস্ফীতি গড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনগুন ছিল। ৭৫তম বর্ষে প্রথমবার আমাদের ছড়িয়ে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিভাবে? রিজার্ভ ব্যাংকের মনিটরি পলিসি বিষয়ক কমিটি প্রতি তিন মাসে বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে রেপো রেট ঠিক করে। অতিমারির সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সুদের হার প্রায় শুন্যের কাছে নিয়ে গেলেও ভারত সেই রাস্তায় যায়নি। বিভিন্ন বামপন্থী নোবেল লরিয়েটের পরামর্শ অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ টাকা ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ে সমস্যার সমাধানে। একমাত্র কৌটিল্যের দেশ ভারত সেই রাস্তায় পা দেয় নি। তাই কোভিড পরবর্তী দুনিয়ায় মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে একমাত্র ভারত।

সপ্তমত, উপরোক্ত বিভিন্ন সংস্কারের ফলে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের মূল গন্তব্য হয় ভারত। চিন তো বটেই, ভিয়েতনাম, ম্যাক্সিকো, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকর্ষণে পাল্লা দিচ্ছে আমাদের দেশ। জিএসটি চালু হওয়ায় সোজা হয়ে গেছে ব্যবসা। একসময় দেড় ডজন অপ্রত্যক্ষ কর ছিল আমাদের দেশে। মুম্বই থেকে সিঙ্গাপুর ব্যবসা করার চেয়ে মুম্বই থেকে কলকাতা ব্যবসা করা ছিল কঠিন। সরল পুনর্বাসন নীতি, নতুন লেবার কোড, জিএসটি, কর্পোরেট কর হ্রাস, বিভিন্ন রাজ্যে এক জানালার সুব্যবস্থা বিদেশীদের কাছে বিনিয়োগ সহজ করে দিয়েছে।

অষ্টমত, খনিজ পদার্থ এবং জ্বালানি তেলের অভাব আমাদের দেশে। অথচ ১৪০ কোটি মানুষের জন্য প্রয়োজন শক্তি। শুধু আরব দেশের উপর নির্ভর হলে ভূরাজনীতিতে আসবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা। মোদিজি আলাদা ভাবে অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে চুক্তি করেন। রাশিয়া, ইরান এবং ভেনেজুয়েলার থেকে তেল নেন আমেরিকার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বন্দর তৈরির চুক্তি সাক্ষর করা হয় বিভিন্ন জলপথে ভারতের প্রভাব বৃদ্ধি করতে এবং ভারতীয় নৌসেনাকে প্রতিষ্ঠা করতে।

নবম কারণ, আজ পৃথিবীর ঔষধালয়। যাত্রা শুরু করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীজি। ১৯৯৯ সাল । তখন এইচআইভি-র প্রকোপে আফ্রিকা মৃত্যুপুরী। কম দামে ভারতীয় CIPLA কোম্পানিকে দিয়ে ওষুধ তৈরি করিয়ে মার্কিন ওষুধের ১% দামে বিভিন্ন আফ্রিকার দেশে পাঠানো শুরু করেন। বাঁচান সেই দেশগুলির মানুষ এবং অর্থনীতিকে। পরের দশ বছর ভারতের জেনেরিক ওষুধ সারা বিশ্বে আরও জনপ্রিয় হয়। এমন অবস্থায় বিশ্বের বড় বড় ওষুধ কোম্পানিগুলি ভারতের পেটেন্ট আইন পরিবর্তনের

জন্য চাপ দেয়া শুরু করে। কিন্তু পাশে দাঁড়ায় একশর বেশী সেই দেশ যারা ভারতের এই 'জীবনের অধিকার'কে অগ্রাধিকার দেবার নীতিতে লাভবান হয়েছে। সঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জের কিছু আধিকারিক এবং বিভিন্ন NGO ভারতের পাশে এসে দাঁড়ায়। ভারতের ওষুধ কূটনীতির সবচেয়ে বড় উদাহরণ কোভিড অতিমারীর সময় যখন ভারতীয় ভ্যাকসিন বাঁচিয়ে দেয় পৃথিবীর ১৬০ টি দেশকে। সরকারের উপর বিরোধীদের চাপ আসে মার্কিন ফাইজার কোম্পানির ভ্যাকসিন কেনার জন্য। কিন্তু পরে দেখা যায় ফাইজার ভ্যাকসিন কার্যকর নয়। বিশ্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানায় ভারতকে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে।

দশ নম্বর কারণ কৃষি ব্যাবস্থার সংস্কার। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সবুজ বিপ্লব হলেও, তার ফল পায় মাত্র আড়াইটা রাজ্য। যারা ২০২১ সালে কৃষি বিল আটকে দিল। বাকী রাজ্যের সত্য ছিল চাষীদের আত্মহত্যা। অধিকাংশ চাষীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিলনা। কৃষি বীমা এতদিন তাহলে কাদের জন্য দিয়েছে সরকার ? শুধু বড় চাষী? ছোট চাষীদের তাহলে মূলধন আসতো কোথা থেকে? হয় বড় চাষী, নয় মহাজন। সবুজ বিপ্লবের বহু আগে পশ্চিমবঙ্গের দুটি সেচ প্রকল্প শেষ হয় এবং ওই সময়ে আরও একটি। কিন্তু বাকী প্রকল্প কেন শুরু হল না? এই অবস্থা সারা দেশেই। তাই শুরু হয় প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা। চালু হয় প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্প, যাতে কৃষককে চাষের মূলধন দিয়ে সমর্থন করা যায়। প্রসঙ্গত আমাদের রাজ্যে এই মূলধন, বাজার, সেচের জল এবং বীমার অভাবে হাজার হাজার একর জমি ফেলে চাষিরা কাশ্মীর থেকে মিজোরামে চাষ করতে যাচ্ছেন।

গত দশ বছরে, দেশের কৃষির এই উন্নতির ফলে বেড়েছে কৃষি রপ্তানি। ভোজ্য তেলের জন্য আমাদের মালয়েশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, রাশিয়া-ইউক্রেনের উপর নির্ভরশীলতা কমছে ধীরে ধীরে। কিন্তু কৃষিতে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল হিমঘরের অপ্রতুলতা। ECA আইনের ভয়ে হিমঘরে বিনিয়োগ করতে সাহস পেত না বিনিয়োগকারীরা। চাষীরা নির্ভর করতেন দেশের বৃহত্তম ঘুঘুর বাসা তথা APMC বাজারের উপর। চাষীদের বাঁচাতে আনা হয়, কৃষিবিল, যা আটকে দেয় বামপন্থী মিডিয়া এবং খালিস্তানি কিছু জঙ্গি গোষ্ঠীদের সমর্থনে হওয়া কৃষি আন্দোলন। সেই মুহূর্তে পিছিয়ে আসে সরকার। কিন্তু বিকল্প পথ বের করে দেশের বাকী রাজ্যের চাষীদের জন্য। এই বছর ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের প্রতিটি ব্লকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে ২০০০ টন সংরক্ষণ ক্ষমতার হিমঘর বানাবে, যার জন্য খরচ হবে এক লক্ষ কোটি। বাড়বে কৃষি রপ্তানি। ওষুধের মত বিশ্বের খাদ্য ভাণ্ডারে পরিণত হবে আমাদের দেশ।

এগারো, এরমধ্যে আরও একটা ভাল খবর এসেছে বিকল্প শক্তির ক্ষেত্রে। গত ২৯ নভেম্বর ভারত সরকার ২০টি খনি নিলাম করছে যেখানে লিথিয়াম সহ বেশ কিছু জরুরী মৃত্তিকা পাওয়া যাবে। আগামী দিনে তেলের বিকল্প হিসেবে এই ধরনের ধাতু ভীষণ জরুরি। ইলেকট্রিক গাড়ী, মোবাইল, LED বাতি থেকে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সামগ্রীতে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

এই বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং সংস্কারের কি ফল আমরা পেলাম?

গতবছর আমাদের আর্থিক বৃদ্ধির হার বৃহত্তম আর্থিক শক্তিগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ, মুদ্রাস্ফীতি ৭৫ বছরে প্রথমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে কম, বিদেশী মুদ্রার ভান্ডার মজুতে রেকর্ড, রপ্তানি সর্বকালীন রেকর্ড, ব্যাংকের লাভ এক লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে প্রথমবার এবং ব্যাংকের NPA নিম্নগামী। $৪ ট্রিলিয়ন অর্থনীতির গন্ডি পেরিয়েছে ভারত। কিন্তু পুরো অংকই তো ডলারে? আমাদের নিজস্ব মুদ্রায় আসল বৃদ্ধির হার কত? অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় কত? একবার হিসেব করা যাক?

২০১৪-র মে মাসে ভারতের জিডিপি ছিল $২ ট্রিলিয়ন, ২০২৩ এ $৪ ট্রিলিয়ন। ২০১৪ তে এক ডলারের দাম ছিল ৫৮.৫৫ এবং এখন ৮৩। ডলারের এই দাম বৃদ্ধি বা হ্রাস হাওয়ায় আমাদের কিছু করার নেই। আন্তর্জাতিক স্তরে সব দেশেরই মুদ্রার অবমূল্যায়ন হয়েছে এবং এই অবমূল্যায়নের হার অন্যান্য মুদ্রার থেকে ভারতের অনেক কম। কিন্তু যদি ডলারের দাম একই থাকতো আমাদের জিডিপি হত $ ৫.৬৭ ট্রিলিয়ন। অর্থাৎ শুধু ভারতীয় মুদ্রায় হিসেব করলে আমাদের জিডিপি ১২.৫% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আর পিপিপি হারে? অর্থাৎ ক্রয় ক্ষমতার নিরিখে? পিপিপি হারে ২০১৪ তে এক ডলারের দাম ছিল ১৭ এবং এখন ২৩। এই হারে হিসেব করলে ভারতের জিডিপি ১১% হারে বৃদ্ধি পায়। কোভিড সবকিছু লণ্ডভণ্ড করার পরেও। এক কথায় চূড়ান্ত সাফল্য। সঠিক পরিকল্পনা, দেশে প্রতি ভালবাসা, সঠিক কূটনৈতিক অবস্থান এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেশকে এই জায়গায় নিয়ে গেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রেটিং এজেন্সি বলছে ভারত কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবীর তৃতীয় অর্থশক্তিতে পরিণত হবে। কিন্তু তাঁদের একটু সংশোধন করতে হবে। ভারত চিন কেও ছাড়িয়ে যাবে। চিনের এক প্রাক্তন রাষ্ট্রনায়ক বলেছেন চিনের জিডিপি বাড়িয়ে দেখানো আছে। বর্তমানে চিনের আবাসন ক্ষেত্রে বড় ধস নেমেছে এবং ডুবেছে বেশ কিছু ব্যাংক, যে খবর বাইরে আসছে না। সঙ্গে কমছে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ। ডুবতে চলেছে তাঁদের উচ্চাকাঙ্খী বেল্ট এন্ড রোড প্রকল্প। তার মধ্যে চলছে তাইওয়ান দখলের পরিকল্পনা। যাকে বলে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি।

সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচারে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারত দ্বিতীয় স্থানে আসা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। আগে থাকবে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ততক্ষণ থাকবে যতদিন গায়ের জোরে ডলার আধিপত্য ধরে রাখবে তারা। তারপর কবির স্বপ্ন সফল করে সেই দিন আসবে যখন "ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

ভারতের বিদেশনীতি বিষয়ক কথকতা

অনিকেত মহাপাত্র

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গত দশ বছরে বদলে গেছে বিদেশ-বিভূঁইয়ে ভারতীয়দের মর্যাদা। কোনও দেশের সরকার, বিরোধী-পক্ষ তো বটেই এমনকি 'হাড়হিম করা' জঙ্গি সংগঠনও ভারতীয়দের না ঘাঁটাতে চেষ্টা করে। এমনটা কি ২০১৪ সালের আগে কল্পনাতেও এসেছিল? ভারতীয় বিদেশনীতি কি তার স্বর্ণযুগে প্রবহমান?

গত দুইবছরের কাল-খণ্ডে ভারত একটি জিনিস প্রমাণ করেছে তা হল অকৃত্রিম বন্ধুতা। কোনও দেশ যদি ভারতকে কখনও সঙ্গ দিয়ে থাকে তাহলে সমকালীন পরিস্থিতি সেই বন্ধুর পাশে দাঁড়ানোর জন্য যতই প্রতিকূল হোক না কেন; ভারত যেনতেন প্রকারেণ তার পাশেই থাকে। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষ বা 'যুদ্ধ' পর্বের দিকে লক্ষ করা যেতে পারে। আমেরিকার সঙ্গে ভারতের কৌশলগত, সামরিক ও বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্যে চলেছে। দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের ব্যক্তিগত সমীকরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় ভারত আমেরিকার ক্রমাগত 'বন্ধুত্বজাত চাপ'-এর সামনে দাঁড়িয়েও অবিচল থেকেছে।

ভারত তার বন্ধুকে কখনও ভোলে না। সেই সঙ্গে ভোলে না তার অতীত শত্রু ও শত্রুতাকেও। ইউক্রেন পূর্বে কখনও তেমনভাবে ভারতের পাশে থাকে নি তাই বারংবার জেলেন্সকির আর্তনাদেও ভারত কর্ণপাত করে নি। বিদেশনীতির সৌজন্য বজায় রেখে ফোন করা হয়েছে, পাঠানো হয়েছে মানবিক বিভিন্ন সাহায্য। কিন্তু বন্ধুর অভিপ্রায়কে কোনভাবে রুদ্ধ করার কোনও প্রচেষ্টা একবারও করা হয় নি, অনুপস্থিত থেকেছে এইরকম কোনও উদ্যোগেও। 'রাজদ্বার', 'শ্মশান', 'দুর্ভিক্ষ', 'রাষ্ট্র বিপ্লব': সবসময়েই প্রায় শর্তহীন পাশে থাকার যে বার্তা দেওয়া হয়েছে ভারতের পক্ষ থেকে তা আগামী দশ বছরের বিদেশনীতির একটি দায়িত্বশীল মডেল নির্মাণের বার্তা। এই বার্তা আমেরিকা সহ বাকি বিশ্বের জন্যও। হয়তো রাশিয়ার জন্যও। চিন-রাশিয়ার সম্পর্কের বিষয়টি স্মরণে রেখে বলা যায়।

আমেরিকার রি-মডেলিং

বর্তমানে ভারতের বিদেশনীতির বড়ো অভিমুখ হল আমেরিকা-ভারত সম্পর্ককে নিজের মতো আকার দেওয়া। সময়ের দাবিতে আমেরিকার সঙ্গে অংশীদারিত্ব বাড়াতে হবে। নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে। তাই ভারত সময়ের টেলারিং মেশিনে ভারত-আমেরিকার সম্পর্কের রূপকে নির্মাণ করছে। বিগত দিনগুলোতে ভারতের বিদেশমন্ত্রীর কথায় বারবার 'ওয়েস্ট' নিয়ে যে তির্যকতা তা এই সম্পর্ক নির্মাণের ভারতীয় অভিমুখ। সাম্প্রতিক সময়ে কানাডা নিয়ে যে টানাপোড়েন তাতে সেই বিষয়টির রিহার্সাল হয়ে গেল। ভারত তার শর্ত অনুযায়ী ভারত-আমেরিকা সম্পর্ককে গড়ে নিচ্ছে। এই পরিণত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিদেশনৈতিক বীক্ষা ভারতকে আগামী পঞ্চাশ বছরের রূপরেখা প্রদান করল। যত দিন যাবে আফ্রিকার ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর স্বর স্পষ্ট হবে। ভারত তার বিদেশনীতির অভিমুখ নির্মাণ করতে গিয়ে ইউরো-আমরো-সেনট্রিক সিদ্ধরসের পতন ঘটাল, সেই মডেল বারবার আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চর্চিত ও গৃহীত হবে।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে ভারত বোধহয় প্রথম দেশ যে 'আই' গোষ্ঠীর কোনও দেশকে এইভাবে নাকানিচোবানি খাওয়াল আর বাকি 'আই' ভায়েরা প্রায় চুপচাপ বসে বসে দেখল। প্রথম প্রথম 'নীল রক্ত' গর্জে উঠতে চাইছিল

কিন্তু দেখল পরিস্থিতি ভালো নয় নিজেরই সুগার-প্রেসারের সমস্যা হতে পারে। তাই মনে মনে প্রবোধ দিল 'এই জাস্টিন জোকার কোনও কাজের নয়, খালি ফ্যাসাদ বাধায়! একে দিয়ে আর নয়।'

ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক এবং রুশ-অভিজ্ঞতা

সম্প্রতি রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় একটি কথা বেশ কয়েকজন রুশির মুখে শুনেছি: 'চিন আমাদের কাছে বাধ্যতা ছাড়া কিছু নয়'। আমেরিকা যদি রাশিয়াকে আরও কিছুটা ভালোভাবে 'ডিল' করতে পারত; যদি 'গণতন্ত্র-গণতন্ত্র বাই' বিসর্জন দিয়ে রাশিয়া ও চিনকে আলাদা রাখার কাজটি সুচারুভাবে করতে পারত তাহলে রাশিয়ার বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ও রাশিয়ার বৃহৎ প্রভাব-বলয় চিনের হাতে পড়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারত না। আমেরিকার ক্ষমতা-কেন্দ্রের একটি অংশে এখনও সোভিয়েত-ফোবিয়া আছে। আছে চিনের প্রতি এক জাতীয় মোহ। তাই ২০২৩ সালেও অতিবৃদ্ধ কিসিঞ্জারকে অতীব দুর্বল শরীর নিয়ে বেজিং ছুটে যেতে হয়েছিল। চিন এখনও তাদের কাছে বাজির ঘোড়া। বিদেশনীতির এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও জড়তা আমেরিকার জন্য অনেক বিড়ম্বনা সৃষ্টি করবে। করছেও কিন্তু হোয়াইট হাউসের ঘুম ভাঙলে হয়!

ভারত-ইউরোপ-মধ্যপ্রাচ্য অর্থনৈতিক করিডোর ঘোষণার মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ইসরাইলে বর্বরোচিত হামলা-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এবং ভারত-ইসরাইল সম্পর্ক

ভারত কখনও তার বন্ধুকে ভোলে না। অতীতে ভারতের কূটনৈতিক বা বিদেশনীতির জড়তার অন্যতম নিদর্শন হল প্যালেস্টাইন সম্পর্কিত নীতি। ইসরাইল ভারতকে বহু সংকটে সহায়তা করেছে। তাই ধর্মান্ধ হামাসের বর্বরোচিত আক্রমণের পর ভারত দ্বিধাহীনভাবে তার প্রতিবাদ করেছিল। ইসরাইলের বিরুদ্ধে আনা পক্ষপাতিত্বপূর্ণ অভিযোগের পক্ষে দাঁড়ায় নি। একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী দেশগুলো একজোট হয়ে ইসরাইলের প্রতিরোধের অধিকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাব আনে । ইসরাইলকে যুদ্ধ-অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করতে উদ্যোগী হয়। ভারত সেই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। মিডল-ইস্টের মুসলিম দেশগুলোকে সন্তুষ্ট রাখতে প্যালেস্টাইন ইস্যুতে 'বিরক্তিকর নিরপেক্ষতা' অবলম্বনের নীতির থেকে ভারত সচেতনভাবে সরে আসে। দুটি রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতি সমর্থন বজায় রেখেও প্যালেস্টাইন নিয়ে আবেগের অতিরেককে দূর করতে পেরেছে ভারত। তাই বিশ্বের বহু দেশ বহুবার ইসরাইলকে যুদ্ধ বন্ধের উপদেশ দিলেও ভারত বন্ধু-রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার অধিকারকে সমর্থন জানায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল রাশিয়া এই ক্ষেত্রে মোটামুটিরকমভাবে প্যালেস্টাইনের পক্ষে। বন্ধু রাশিয়ার এই অবস্থান নিজের কৌশলগত ও বিদেশনীতিগত। এটি নিজের 'কোর ওয়ার ' নয়। অস্তিত্বের লড়াই নয়। তাই এই ক্ষেত্রে ভারত বন্ধু ইসরাইলের অস্তিত্বের লড়াইয়ের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছে।

আলিঙ্গনে আবদ্ধ ভারত-ইজরায়েলের দুই প্রধানমন্ত্রী।

শেষ করা যেতে পারে ভারতের বিদেশনীতির আর এক মাস্টারস্ট্রোক দিয়ে, যে পরিপক্কতা ভারতকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে পেরেছে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিশ্বের বেশ কিছু দেশ প্রস্তাব আনে রাষ্ট্রসংঘে, এই ইসরায়েলের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের পর্বে । তারা চায় ইসরাইলকে যুদ্ধ-অপরাধী বলে দাগিয়ে দিতে। আর ইসরাইলকে গাজায় হামাস-বিরোধী অভিযান বন্ধ করার ব্যাপারে বাধ্য করতে। কানাডা প্রস্তাব আনে একটি সংশোধনী যুক্ত করার। 'হামাসের বর্বরোচিত আক্রমণ'-এর বিষয়টি যুক্ত করার কানাডার প্রস্তাবে ভারত পূর্ণত সমর্থন জানায়। সেই পর্বে রাষ্ট্রসংঘেও বাদানুবাদ চলেছে ভারত-কানাডার। কিন্তু ভারতের পরিণত বিদেশনীতি-বীক্ষা কানাডার প্রস্তাবকে খোলা চোখে দেখতে পারে। এই দৃষ্টি দূরদর্শিতার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করে।

২০২৩ সালের শেষ পর্যায়ে দুটি বিদেশনৈতিক ঘটনা লক্ষ করার মতো। আমেরিকার একটি অভিযোগ, আন্তর্জাতিক অপরাধী পান্নুকে নাকি হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। অভিযোগের তীর ভারতের দিকে। পোষ্য কানাডাকে অর্থাৎ কানাডিয়ান জোকারকে আমেরিকার প্রবোধ দেওয়ার প্রচেষ্টা বলেই মনে হয় বিষয়টি। কারণ এই বিষয়ে আমেরিকার মুভমেন্ট খুব অসংলগ্ন। আর ভারত বিষয়টিকে নিয়ে যথেষ্ট অবহেলার সঙ্গে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। আমেরিকা দেয়ার ইজ নো আমেরিকা।

মরিচঝাঁপি গণহত্যা

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে বামফ্রন্ট সরকারের দ্বিচারিতার করুণ প্রেক্ষাপট

রুবি সাঁই

১৯৭৯ সালের ২৬ জানুয়ারি ৩০টি পুলিশের লঞ্চ ঘিরে ফেলে মরিচঝাঁপি। ৩১ জানুয়ারি উদ্বাস্তুদের উপর প্রথম গুলি চলে। বাসিন্দাদের মতে ৩৬ জন মানুষ মারা যায়। ১৯৭৯ সালের ১৩ মে শুরু হয় চূড়ান্ত আক্রমণ। কমপক্ষে ১০০-১৫০ জন মানুষকে খুন করে ফেলে দেওয়া হয় নদীর জলে। মরিচঝাঁপি গণহত্যার আজ প্রায় ৪৫ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত কিন্তু প্রকৃত অপরাধীরা কি সাজা পেল?

বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে যে সকল নির্মম গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম মরিচঝাঁপি গণহত্যা। বামফ্রন্ট সরকার একদিকে উদ্বাস্তু ও ছিন্নমূল মানুষদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করে এবং অন্যদিকে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার প্রতিযোগিতায় তাঁদেরকেই পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে।

ভূমিকা:

১৯৭৯ সালের মরিচঝাঁপি গণহত্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সঙ্গে অনেকটা সম্পর্কিত। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা প্রদেশও দ্বিখণ্ডিত হয়। পাকিস্তানে যায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৬-১৯৫২ সালের মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অসংখ্য উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে মোটামুটি বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে অনেকটা সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু অসংখ্য বাঙালি সেই সময় পূর্ববঙ্গে রয়ে যায় যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

মহম্মদ আলি জিন্নাহর মৃত্যুর পর পাকিস্তান ক্রমেই ইসলামি রাষ্ট্রের পথে অগ্রসর হতে থাকে এবং সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ বাড়তে থাকে। অবশেষে ১৯৬৪ সালের হজরত বালের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত এবং পাকিস্তানে ব্যাপক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে অসংখ্য সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মের উদ্বাস্তু নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ বনগাঁ, গেদে, রানাঘাট সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসতে থাকে। ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পুনর্বাসনের কিছুটা ব্যবস্থা হলেও ১৯৫২-১৯৬৫ সালে আগত উদ্বাস্তুদের সীমিত সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উদ্বাস্তু ক্যাম্পে পাঠানো হয়। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের হিসেব অনুযায়ী বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু শরণার্থী আগমনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্ভব নয় বলে ঘোষণা করে। যার ফলে ১৯৫৩ সাল থেকে আগত শরণার্থী উদ্বাস্তুদের আন্দামান পাঠাতে শুরু করে।

১৯৫৬ সালে দণ্ডকারণ্য প্রজেক্ট অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ- উড়িষ্যার মালকানগিরি সহ ভারতবর্ষের দুর্গম প্রান্ত যেখানে মানুষের বসবাসের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী সেখানে এই সমস্ত ভিটেমাটি হারানো, হতদরিদ্র, ছিন্নমূল,

প্রান্তিক ও উদ্বাস্তু মানুষদের জোরপূর্বক তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাঠানো হয়। এইরকম এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে তৎকালীন বামপন্থায় বিশ্বাসী নেতৃত্ববর্গ, দণ্ডকারণ্যে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের বেঁচে থাকার অনুপযোগী পরিবেশ থেকে বাঙালি সংস্কৃতিতে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন শক্তিশালী করে তোলে। অবশেষে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট উদ্বাস্তু ভাবাবেগকে ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে সফল হয়।

উদ্বাস্তু ভাবাবেগ ও বামফ্রন্ট সরকারের ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি:

উদ্বাস্তু বাঙালিরা ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষা ছাড়াও পানীয় জলের অভাব এবং পাথুরে মাটি কৃষিকাজের অনুপযোগী হওয়ায় দণ্ডকারণ্যে যেতে রাজি ছিল না। তবুও অসংখ্য মানুষ দণ্ডকারণ্যে জীবন ও জীবিকার তাগিদে প্রতিকূল পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার লড়াই শুরু করে যার ফলে ম্যালেরিয়া, ডায়েরিয়া সহ বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। ১৯৪৭ সালে রায়পুরের মানা ক্যাম্পে C.R.P.F জওয়ানরা গুলি চালায়। তাতে কয়েকজন উদ্বাস্তু মারা যান ও অনেকে আহত হন।

তৎকালীন বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু সহ অন্যান্য নেতৃত্ববর্গ দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করেন এবং প্রচার চালান পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে তাদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। উদ্বাস্তুদের ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে। মুখ্যমন্ত্রী হন সিপিএম নেতা জ্যোতি বসু।

স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতার রদবদলে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের মধ্যে আনন্দের সীমা থাকে না, কেবলমাত্র নিজেদের সংস্কৃতি ঘেঁষা পরিবেশে বাঁচার স্বপ্নে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জ্যোতি বসুর জন্মের আগেই বসু পরিবার পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জের বারদী গ্রামে (যেখানে ঠাকুর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম অবস্থিত) বাস করতেন এবং সেখানে তাদের জমিদারি ছিল। জ্যোতি বসু পূর্ববঙ্গের মানুষ হয়েও পশ্চিমবঙ্গে নিজের রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন এবং প্রতিষ্ঠিত হন। তাই পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ওপর তিনি সহৃদয় থাকবেন এমনটাই স্বাভাবিক ছিল।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে বামফ্রন্ট সরকারের দ্বিচারিতা:

বামপন্থী দলগুলির পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, ১৯৭৭ সালের পর থেকে দণ্ডকারণ্য থেকে অসংখ্য উদ্বাস্তু নিজেদের ঘটিবাটি বিক্রি করে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের আশায় যাত্রা শুরু করে। তাদের স্লোগান ছিল "চল কলকাতা, চল সুন্দরবন"। তারা এও মনে করেছিল যে দণ্ডকারণ্যে অপরিচিতি ভাষা, সংস্কৃতি এবং সেনার গুলিতে প্রাণ হারানোর চেয়ে বাংলার সুন্দরবনে বাঘের পেটে গিয়ে মরা ভালো। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতির কারণে ক্ষমতায় আসে তারা তা ক্ষনিকের ব্যবধানে ভুলে যায়। অসংখ্য উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল মানুষের স্রোত দেখে পশ্চিমবঙ্গের সাজানো বাগানে অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশের কারণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা তাদের কাছে সমস্যা তৈরি করতে পারে যা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে, এমন চিন্তাধারা দণ্ডকারণ্য থেকে আগত উদ্বাস্তুদের স্বপ্নকে পুনরায় দুঃস্বপ্নে পরিণত করে।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন রেল স্টেশনে দণ্ডকারণ্য থেকে আগত উদ্বাস্তুরা এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের বলপূর্বক ফিরতি ট্রেনে অমানবিক ভাবে ফেরত পাঠাতে তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু তবুও অসংখ্য মানুষ পুলিশ প্রশাসনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ট্রেন লাইন দিয়ে হাঁটা পথে পৌঁছে যায় পশ্চিমবঙ্গের হাসনাবাদ এবং পরে মরিচঝাঁপি দ্বীপে। মরিচঝাঁপির আশেপাশের দ্বীপ এবং গ্রামগুলি সাতজেলিয়া, কুমিরমারি, ঝড়খালি, ছোট মোল্লাখালি ইত্যাদি এলাকাগুলিতে তখন দীর্ঘকাল ধরে চন্ডালদের বাসস্থান। ১৯৩০ সাল থেকে ব্রিটিশরা সুন্দরবনের কিছু অংশে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা থেকে নমঃশূদ্রদের নিয়ে এসেছিল, আর সঙ্গে ছিল স্থানীয় মুন্ডা ও সাঁওতাল আদিবাসী। দণ্ডকারণ্য থেকে আগত নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মরিচঝাঁপির পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষদের সঙ্গে ছিল পুরনো রক্তের টান ও একে অপরের আত্মীয়তার সম্পর্ক। আর ছিল একই সংস্কৃতি ও ভাষা পরিবেষ্টিত পরিবেশ ও প্রান্তিক অবস্থান। এই পূর্ব পরিচিতি ও সহমর্মিতার কারণে স্থানীয় উদ্বাস্তুদের সহযোগিতায় দণ্ডকারণ্য থেকে আগত উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপির বসবাস অনুপযুক্ত পরিবেশকে নিজেদের শ্রম ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার উপযুক্ত পরিবেশ হিসেবে গড়ে তুলতে থাকে।

প্রথমে তারা নারকেল ও ঝাউ গাছের ফাঁকে-ফাঁকে গড়ে তোলে অস্থায়ী খড়ের ছাউনিওয়ালা বাসস্থান। আশেপাশের বাসিন্দাদের সহযোগিতায় শিখে যায় কাঁকড়া ধরা, মাছ ধরা, ছোট বাঁধ দিয়ে নোনা জল আটকানোর পদ্ধতি। চাষ আবাদের জন্য ১২৫ বর্গমাইল মরিচঝাঁপি, দণ্ডকারণ্য থেকে আসা প্রায় ৩০ হাজার উদ্বাস্তুদের পক্ষে বাঁচার অনেকটা স্বপ্ন দেখিয়েছিল। নিজেদের উদ্যোগে স্কুল তৈরি করা, নৌকার লাইসেন্স পাওয়া, পানীয় জলের জন্য টিউবওয়েল বসানো, মাছের ভেড়ি, নুনের আড়ত এমনকি গড়ে উঠল ডিসপেনসারি এবং ছোটদের জন্য প্রাথমিক স্কুল। বেঁচে থাকার এই উদ্যোগ উদ্বাস্তুদের একান্তই নিজেদের প্রয়াস ও নিজেদের পয়সায়। এই সময় বাংলার কিছু সচেতন নাগরিকবৃন্দ যেমন গৌরকিশোর ঘোষ, জ্যোতির্ময় দত্ত প্রমুখদের উদ্যোগে সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানের জলসা সংঘটিত করে প্রায় ২০ হাজার টাকা তুলে দিয়েছিল মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু উন্নয়ন সমিতির হাতে।

আশা ছিল দণ্ডকারণ্য থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিষয়টি বামফ্রন্ট সরকার হয়তো অত্যন্ত সহনশীলতার সঙ্গে বিচার করবে এবং ন্যূনতম বসতির অনুমতিটা প্রদান করবে। কিন্তু ১৯৭৭ সালে সেই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে দণ্ডকারণ্যে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের ভোটে উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের বিধানসভার কটি আসন জয়লাভ করবে তার স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সিপিএম। দণ্ডকারণ্যে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের প্রতি এমন দ্বিচারিতার কারণে উদ্বাস্তু সমিতি গুলি সিপিএম-কে সমর্থন করতে অস্বীকার করে।

পাশাপাশি সেই সময়েই পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্দেশখালির ১৪টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ১২টিতে আরএসপি জয়লাভ করে। সম্ভবত জ্যোতি বসু মনে করেছিলেন এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপিতে থাকতে দিলে সিপিএম-এর পরিবর্তে তাদের শরিক দল আরএসপি-র প্রভাব বাড়বে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও নিজেদের পার্টির অবস্থানকে প্রশাসনিক ভাবে কার্যকরী করতে মরিচঝাঁপিতে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের রিজার্ভ ফরেস্ট অ্যাক্ট-এর আওতায় নিয়ে এসে 'সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে' বলে তাঁরা অভিযোগের আঙ্গুল তোলে উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে।

বামফ্রন্টের মরিচঝাঁপি গণহত্যা:

১৯৭৯ সালের ২৬ জানুয়ারি ৩০টি পুলিশের লঞ্চ ঘিরে ফেলে মরিচঝাঁপি। ২৭ জানুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি হয়। মরিচঝাঁপি থেকে বেরোনো এবং প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। চালানো হয় কাঁদানে গ্যাস, উপড়ে ফেলা হয় মিষ্টি জলের টিউবয়েল, জ্বালিয়ে দেওয়া হয় উদ্বাস্তুদের ঘরবাড়ি। পাশের কুমিরমারি গ্রাম বা অন্য কোন স্থান থেকে মরিচঝাঁপিতে খাদ্য, পানীয় জল, ঔষধপত্র সরবরাহও বন্ধ হয়ে যায়। অনাহারে, তেষ্টায়, বিনা চিকিৎসায় উদ্বাস্তুরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। অনাহারে ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে কিছু মানুষ মারা যায়। ১৯৭৯ সালের ৩১ জানুয়ারি উদ্বাস্তুদের উপর প্রথম গুলি চলে। বাসিন্দাদের মতে ৩৬ জন মানুষ মারা যায়।

এরই মধ্যে পুলিশের চোখ এড়িয়ে নদী সাঁতরে একজন উদ্বাস্তু কলকাতার প্রেসক্লাবে এসে কুমিরমারিতে গুলি চালানোর বিবরণ দিলে তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকা ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের সংবাদপত্রে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু নিপীড়নের বৃত্তান্ত তুলে ধরে। রাজ্য বিধানসভায় তৎকালীন কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা কাশীকান্ত মৈত্র মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু নিপীড়নের সরকারি প্রহসন সম্পর্কে মতবিরোধ তৈরি করে এবং উদ্বাস্তুদের প্রতি অমানবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে ওয়াক আউট করেন। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের সমর্থকরা, জ্যোতি বসু সরকারের অমানবিক অত্যাচার এবং অর্থনৈতিক অবরোধের বিরুদ্ধে বিচারের আশায় হাইকোর্টে মামলা করেন। বিচারপতি উদ্বাস্তুদের স্বপক্ষে রায় দেন। কিন্তু জ্যোতি বসুর সরকার হাইকোর্টের নির্দেশকে অমান্য করে, মরিচঝাঁপিকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। এমনকি ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রমুখ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি মরিচঝাঁপির অসহায় মানুষগুলিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলে সরকার তাদের ও ফিরিয়ে দেয়। জ্যোতি বসু ও সিপিএম নেতৃত্ব মরিচঝাঁপিকে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং সেখানে অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবির চলছে বলে দাবী করে সংবাদমাধ্যমকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, "এই ধরনের স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে উত্তেজক খবর পরিবেশন না করে জাতীয় স্বার্থে সরকারের অনধিকার প্রবেশকারীদের উচ্ছেদের সমর্থনে বক্তব্য রাখা উচিত"।

কেন্দ্রে তখন মোররাজি দেশাই এর টলমল সরকার। জ্যোতি বসুর সমর্থন অত্যন্ত প্রয়োজন তাই কেন্দ্র মরিচঝাঁপির ঘটনা জেনেও কোন পদক্ষেপ না করাকে শ্রেয় মনে করেছিল। অর্থনৈতিক অবরোধ, ক্ষুধা এবং পিপাসায় ক্লান্ত মরিচঝাঁপি দ্বীপের অসহায় উদ্বাস্তু মানুষরা ঘাস-পাতা খেয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। খাদ্য বলতে গেড়ে-গুগলি এবং নদীর ধারে গজানো নোনা শাক যদু পালং। ১৯৭৯ সালের ১৩ মে শুরু হয় চূড়ান্ত আক্রমণ। পুলিশ এবং স্থানীয় সিপিএম-এর গুন্ডাবাহিনী রাতের অন্ধকারে মরিচঝাঁপি আক্রমণ করে। নিরস্ত্র অসহায় হতদরিদ্র মানুষগুলির বেঁচে থাকার একমাত্র আশ্রয় কুঁড়েঘরগুলিকে পুড়িয়ে দেয়। অনেক উদ্বাস্তু যুবক গ্রেপ্তার হন এবং উদ্বাস্তু মহিলাদের উপর চলে গণধর্ষণ। পলায়নরত উদ্বাস্তুদের নৌকাগুলিকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। কমপক্ষে ১০০-১৫০ জন মানুষকে খুন করে ফেলে দেওয়া হয় নদীর জলে। তিন দিন ধরে তান্ডব চালানোর পর অবশেষে ১৯৭৯ সালের ১৬ মে মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু শূন্য হয়।

মরিচঝাঁপি উচ্ছেদের পরে প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি উদ্বাস্তু পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হয়। ফেরার সময় অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায় এবং মরিচঝাঁপিতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পর কিছু উদ্বাস্তু পরিবার পুলিশের চোখ এড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে আত্মগোপন করে বসবাস করতে শুরু করে, যাদের সংখ্যা নির্ধারণ করা যায়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অধ্যাপক অলক কুমার ঘোষ মরিচঝাঁপি গণহত্যা নিয়ে গবেষণা করে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরার উদ্দেশ্যে জ্যোতি বসুর রাজত্বের শেষের দিকে একটি বই লিখেছিলেন, এই বইটিতে অলক বাবু মরিচঝাঁপি গণহত্যাকে "দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড" বলে অভিহিত করেন। কিন্তু জ্যোতি বসু সরকার পরিকল্পিতভাবে এই বইয়ের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। মরিচঝাঁপি গণহত্যা নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ গবেষণা করেছেন ইতিহাসের অধ্যাপক স্বপন কুমার মন্ডল মহাশয়। তাঁর ভাষায় "জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে মরিচঝাঁপি গণহত্যা অত্যন্ত হৃদয় বিদায়ক ঘটনা। অবশ্য কমিউনিস্টদের এই ধরনের অপকর্ম নতুন কোন ঘটনা নয়। পৃথিবীতে কমিউনিস্ট শাসনের জন্মলগ্ন থেকেই এই গণহত্যা সংগঠিত হয়ে চলেছে....."

২০১২ সালের ২৭ মে কেরালার ইদ্দুকি জেলার সিপিএম সম্পাদক এম. এম. মনি একটি প্রকাশ্য সভায় বলেন, "বিরোধী কণ্ঠচ্ছেদ করতে কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টান্তের শেষ নেই" তাই আমরা 'মরিচঝাঁপি' গণহত্যাকে কমিউনিস্ট শাসকদের পরম্পরাগত গণহত্যার অংশ রূপে চিহ্নিত করতে পারি"।

তুষার ভট্টাচার্য মহাশয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমস্ত বিরোধিতা উপেক্ষা করে মরিচঝাঁপি গণহত্যা সম্পর্কে একটি অসামান্য তথ্যচিত্র প্রস্তুত করেছেন- "Marichjhanpi 1978-79: Tortured Humanity" যদিও তৎকালীন জ্যোতি বসুর সরকার অসংখ্য উদ্বাস্তু মানুষের রক্তে হোলি খেলার পর শেষ পর্যন্ত মাত্র দুজন মানুষের মৃত্যু স্বীকার করে। মরিচঝাঁপি গণহত্যার আজ প্রায় ৪৫ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত কিন্তু প্রকৃত অপরাধীরা সাজা পাওয়া তো দূরের কথা প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হয়নি।

তথ্যসূত্র:

1. Bhattacharya, Snigdhendu (25 April 2011). "Ghost of Marichjhapi returns to haunt". Hindustan Times. Retrieved 5 August 2013.
2. Chowdhury, Debdatta (2011). "Space, identity, territory: Marichjhapi Massacre, 1979". The International Journal of Human Rights. 15 (5): 664–682.
3. Halder, Deep "Blood Island: An oral History of the Marichjhapi Massacre" Harper Collins India, ISBN- 978-9353025878
4. Mandal, Jagadish Chandra (2002). Marichjhapi: Naishabder Antarale. Sujan Publications
5. প্রামাণিক, মৃত্যুঞ্জয় "মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু বিতরণ ও গণহত্যার ইতিহাস" গঙ্গাচিল, ISBN- 978-93-88380-79-9
6. পাল, মধুময় "মরিচঝাঁপি ছিন্ন দেশ ছিন্ন ইতিহাস" গঙ্গাচিল, ISBN-97888189834937
7. সেনগুপ্ত, দেবযানী (3 অক্টোবর 2018)। "পশ্চিমবঙ্গের মরিচঝাঁপিতে দলিত উদ্বাস্তুদের ভুলে যাওয়া গণহত্যা"

ফেক নিউজ

বলা হয় বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে যে ব্যক্তি সবথেকে বেশি ফেক নিউজের শিকার হয়েছেন তাঁর নাম নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি। মিথ্যে অভিযোগ, খবর আর প্রোপাগান্ডা তাঁকে বিদ্ধ করেছে দিনের পর দিন। রাম লালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর এবার সনাতনীদের পরমপূজ্য ঈশ্বরকে নিয়েও শুরু হয়েছে প্রোপাগান্ডা আর ফেক নিউজের নোংরা খেলা। এবারের সংখ্যায় আমরা শুধু ভগবান রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে দেওয়া ফেক নিউজ নিয়ে আলোচনা করবো।

'বাংলাপক্ষ'-এর মিথ্যাপ্রচার

ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের পবিত্র জন্মস্থান অযোধ্যা এখন যেন এক ছোট্ট ভারতবর্ষ। শ্রী রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গোটা ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ উপস্থিত হয়েছে অযোধ্যায়। তাই উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং অযোধ্যার স্থানীয় প্রশাসন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নাম ভারতীয় সংবিধানের বাইশটি ভাষার প্রতিটিতেই লিখে দিয়েছে জনগণের সুবিধার্থে। স্বাভাবিকভাবেই বাইশটি নাম একটি বোর্ডে লেখা সম্ভব নয়। তাই একাধিক বোর্ড মিলিয়ে লেখা হয়েছে সেগুলি। এদিকে 'বাংলাপক্ষ' তথা ওই সংগঠনের মাথা গর্গ চট্টোপাধ্যায় (মমতা ব্যানার্জির বিশেষ স্নেহধন্য) যে বোর্ডে বাংলা ভাষায় লেখা আছে সেটার ছবি না দিয়ে অন্য বোর্ড দেখিয়ে বলতে আরম্ভ করে অযোধ্যায় বাংলা ভাষাকে অপমান করা হয়েছে। বাঙালির আবেগকে মিথ্যে খবরের মাধ্যমে উসকে দিয়ে গোটা রাজ্যে বিজেপিকে বাঙালি বিরোধী হিসেবে প্রচার করতে শুরু করে।

আসল খবরঃ অবশ্য সত্যি সামনে আসতে দেরি হয়নি। কিছু দিনের মধ্যেই বাংলা ভাষায় লেখা বোর্ড এবং হোর্ডিংয়ের ছবি সামনে চলে আসে। তৃণমূল সমর্থিত বাংলাপক্ষের মিথ্যার ফানুস ফেটে যায় সজোরে। ভারতীয় জনতা পার্টি যে বাঙালিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় সেটা আবারও প্রমাণিত হয়ে যায়। আসলে 'বাংলাপক্ষ' নামের সংগঠন কাগজে-কলমে বাঙালির কথা বলার জন্য হলেও মুখোশের আড়ালে তা আসলে তৃণমূল সমর্থিত রাষ্ট্রবিরোধী জামাতপন্থী এক সংগঠন। বিজেপি এবং হিন্দুত্ববাদের বিরোধিতা করাই এই সংগঠনের প্রধান কাজ।

মিথ্যাবাদী কংগ্রেসঃ

অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার ঠিক কিছুদিন আগে কংগ্রেসের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতিদের তৈরি ফেসবুক পেজ এবং ছোটখাটো মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয় প্রকৃত জন্মস্থানে (অর্থাৎ যেখানে বাবরের সেনাপতি মীর বাঁকি জোর করে বাবরি মসজিদ তৈরি করেছিল) নাকি রাম মন্দির তৈরি হচ্ছে না। উদ্দেশ্য স্পষ্টতই রাম জন্মভূমি নিয়ে সনাতনীদের মধ্যে তৈরি হওয়া গগনচুম্বি আবেগকে আঘাত করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।

আসল খবরঃ বলার অপেক্ষা রাখে না হিন্দুবিরোধী রাহুল কংগ্রেসের ফেক নিউজ এ যাত্রাতেও সফল হয়নি। মিডিয়া রিপোর্ট সামনে আসতেই ল্যাজ গুটিয়ে রাহুল কংগ্রেসের পলায়ন।

বাম বুদ্ধিজীবীদের 'চতুরতা ক্লান্ত লাগে খুব'

শত চেষ্টাতেও যখন পবিত্র জন্মস্থানে মন্দির তৈরি আটকানো গেল না তখন বাম এবং কংগ্রেসের পোষ্য বুদ্ধিজীবী মহল তথা হিন্দুবিরোধী শক্তিরা বলতে আরম্ভ করল রাম জন্মভূমি মন্দিরে নাকি ব্রাহ্মণ ছাড়া কারোর প্রবেশাধিকার নেই।

আসল খবরঃ জিয়াউল হক বা এ পি রজকের মত বাম দালালদের ছড়িয়ে দেওয়া ফেক নিউজ বাম, কংগ্রেস এবং তৃণমূল জোটের কাছে বুমেরাং হয়ে যায় যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (যিনি নিজেই ওবিসি তালিকাভুক্ত) উপস্থিত থাকেন। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শুধু হিন্দুরাই নয়, অন্যান্য ধর্মের অনেক মানুষও সেদিন উপস্থিত ছিলেন প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে।

তথাকথিত সেকুলার-দের স্বপ্নভঙ্গ

খবরে প্রকাশ চার পূজনীয় শংকরাচার্য নাকি রাম মন্দির তৈরীর বিরোধিতা করেছেন। শুধু খবর বললে ভুল হবে, মমতা ব্যানার্জি থেকে আরম্ভ করে সিপিএম এবং কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতারা এই একই দাবি করে রাম মন্দির এবং তৎসংলগ্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মকে ছোট করতে শুরু করে।

আসল খবরঃ বলাই বাহুল্য এ খবরও মিথ্যে ছিল। আমাদের পূজনীয় শঙ্করাচার্যগণ রাম মন্দিরের বিরোধিতা করবেন এটা তৃণমূল ও বামেদের দিবাস্বপ্ন ছিল। বাস্তবে ওনারা সকলেই রাম মন্দিরের পক্ষে আছেন এবং রামভক্তদের আশীর্বাদও করেছেন।

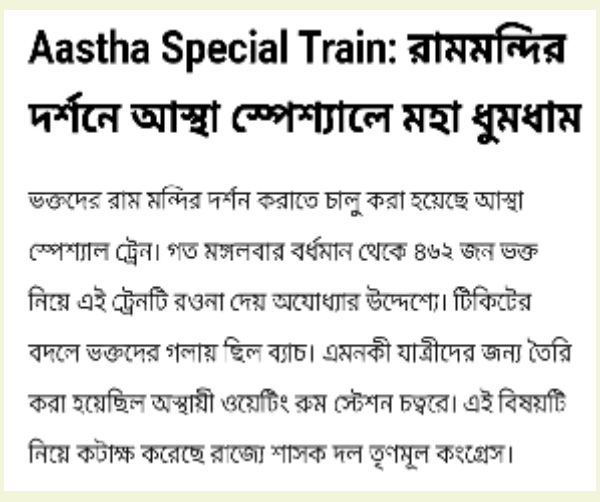

'মিনমিনে মিডিয়া'-র অর্ধসত্য

অযোধ্যার পবিত্র রাম জন্মভূমি মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আস্থা স্পেশাল ট্রেন চালাচ্ছে ভারতীয় রেলওয়ে। আর সেখানেই গাত্রদাহ বাংলার প্রথম সারির মিডিয়া হাউসগুলোর। তারা প্রচার চালাচ্ছে রাম মন্দির দর্শনের এই উদ্যোগ পুরোপুরি সরকারি খরচে। বলার অপেক্ষা রাখে না এ খবর একশো শতাংশ মিথ্যে।

আসল খবরঃ একজন রামভক্তকে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই বিশেষ ট্রেনে অযোধ্যা যেতে গেলে বর্ধমান থেকে ১৪০০ টাকা এবং কলকাতা থেকে ১৬০০ টাকা দিতে হচ্ছে। অন্যান্য ট্রেনে স্লিপার ক্লাসে বর্ধমান থেকে অযোধ্যা ট্রেন ভাড়া ৪১০ টাকা। আপ ডাউন মিলিয়ে ৮২০ টাকা। একই ভাবে হাওড়া থেকে আপ ডাউন ভাড়া ৮৯০ টাকা। অর্থাৎ সাধারণ সময়ের ভাড়ার থেকে অনেকটা বেশি অর্থ দিয়েই করা হয়েছে এই বিশেষ ব্যবস্থা। বাকি রইল অযোধ্যায় দেড় দিন থাকা খাওয়ার খরচ। সেটা রাম মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংস্থা বহন করছে। এতদিনে নিশ্চয়ই সকলেই অবগত আছেন যে মন্দির নির্মাণ থেকে আরম্ভ করে দর্শন বা ভোগ প্রসাদের সমস্ত খরচ ভক্তদের প্রণামী এবং অনুদানের মাধ্যমেই উঠে আসছে। ভারত সরকারের এক টাকাও এখানে খরচা হয়নি। সরকারি খরচে নিজেদের দল চালানো তৃণমূল কংগ্রেসের এবং তাদের দালাল প্রথম সারির কিছু মিডিয়া হাউসের জেনে রাখা দরকার মন্দির নির্মাণের জন্য ধার্য মোট খরচের অন্তত পাঁচ গুণ অর্থ ইতিমধ্যে চাঁদা স্বরূপ জমা পড়েছে।

নয়াদিল্লিতে 'সুশাসন মহোৎসব ২০২৪' উদ্বোধন করছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জগত প্রকাশ নাড্ডাজি।

নয়াদিল্লিতে পার্টির সদর দফতরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জগত প্রকাশ নাড্ডাজির সভাপতিত্বে জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সভা।

নয়াদিল্লিতে ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের কিছু বিশেষ মুহূর্ত।

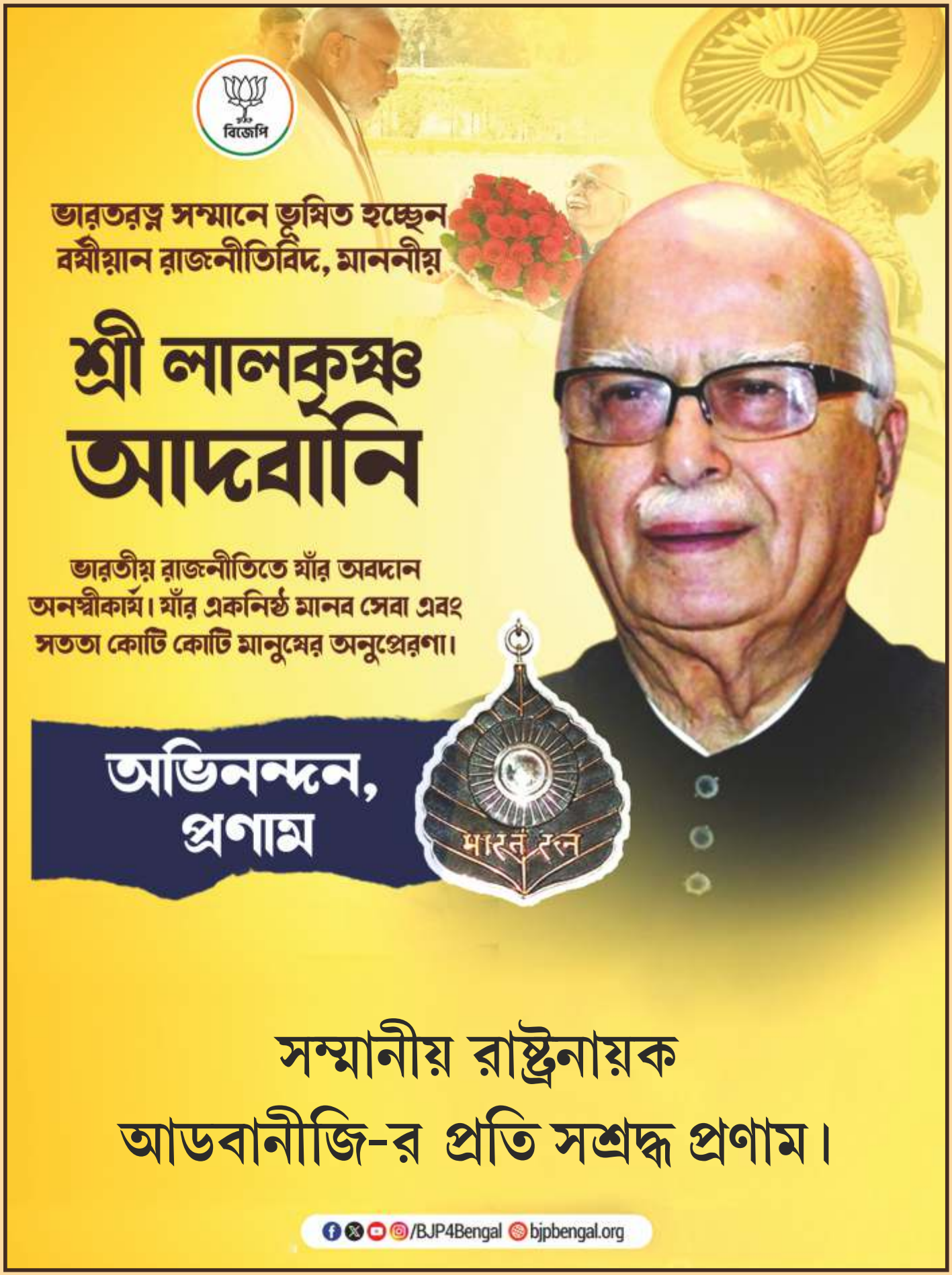

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক টী.সি. দত্ত মার্চেন্টস প্রা.লি., কলকাতা - ৭০০ ০২৫ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।